KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA
18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

Record No. : KLMLGK 2007/	Place of Publication : ৬ নর্থ রোড, যাদবপুর, কল-৩২
Collection : KLMLGK	Publisher : প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত
Title : অলিন্দ (ALINDA)	Size : 8.5"/5.5"
Vol. & Number : (গ্রীষ্ম সংকলন) (শরৎ সংকলন) (শীত সংকলন) (শীত সংকলন)	Year of Publication : ১৩৭৭ ১৩৭৭ ১৩৭৮ ১৪০০
	Condition : Brittle / Good ✓
Editor : প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত	Remarks :

C.D. Roll No. : KLMLGK

শীত সংকলন

১৩৯৮

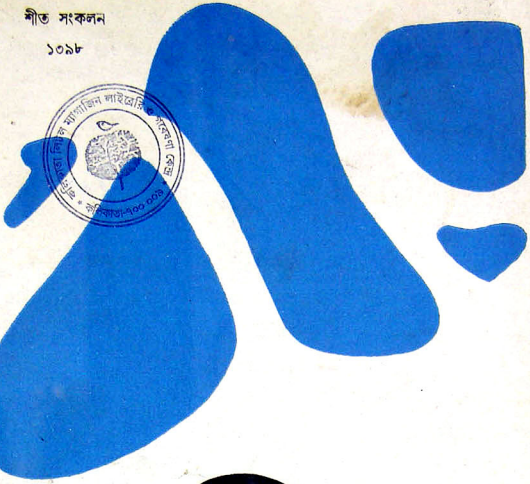

আলিন্দ

সম্পাদক

প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত

অলিন্দ

ষাণ্মাসিক সাহিত্য-সংকলন

শীত ১৩৯৮

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি ও গবেষণা কেন্দ্র • কলিকাতা-৭০০ ০০৯

অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, পূর্ণেন্দু পত্রী, দিব্যেন্দু পালিত, অমিতাভ দাশগুপ্ত, দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, নবনীতা দেবসেন, অরুণকুমার ঘোষ, ভাস্কর চক্রবর্তী, সামসুল হক, দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায়, কালীকৃষ্ণ গুহ, রত্নেশ্বর হাজরা, সজল বন্দ্যোপাধ্যায়, সুশীল সিংহ, সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়, অজিত বাইরী, মঞ্জুষ দাশগুপ্ত, মঞ্জুভাষ মিত্র, মতি মুখোপাধ্যায়, অভী সেনগুপ্ত, দেবী

||||||||||||||||||||||||||||||| সংশোধন |||||||||||||||||||||||||||||||

অনিচ্ছাকৃত মুদ্রণ-প্রমাদে সূচিপত্র থেকে আশিস সান্যাল, সুতপা সেনগুপ্ত এবং অভীক মজুমদারের নাম বাদ পড়ায় আমরা দুঃখিত।

শম্ভু বসু, [illegible]

দীপঙ্কর গোস্বামী, ভাস্বতী রায়চৌধুরী, নিয়াজুল হক, শ্যামাপ্রসাদ সরকার, খোকন বসু, অর্ণব সাহা, রথীন্দ্র মজুমদার, কেদার ভাদুড়ী, কালিদাস চট্টোপাধ্যায়, কৃষ্ণসাধন নন্দী, চন্দন রায়, সঞ্জয় রায়, অরুণ মুখোপাধ্যায়, গৌতম ঘোষদস্তিদার এবং প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত।

সম্পাদক : প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত

প্রচ্ছদ : মেরিঅ্যান দাশগুপ্ত

প্রকাশক : ডক্টর পার্থ দাশগুপ্ত

মুদ্রক : স্বর্ণাক্ষর

৩১৯/২, নেতাজি সুভাষ রোড, হাওড়া-১

দাম : পাঁচ টাকা

অলিন্দ

ষাণ্মাসিক সাহিত্য-সংকলন

শীত ১৩৯৮

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি ও গবেষণা কেন্দ্র • কলিকাতা-৭০০ ০০৯ •

অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, পূর্ণেন্দু পত্রী, দিব্যেন্দু পালিত, অমিতাভ দাশগুপ্ত, দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, নবনীতা দেবসেন, অরুণকুমার ঘোষ, ভাস্কর চক্রবর্তী, সামসুল হক, দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায়, কালীকৃষ্ণ গুহ, রত্নেশ্বর হাজরা, সজল বন্দ্যোপাধ্যায়, সুশীল সিংহ, সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়, অজিত বাইরী, মঞ্জুষ দাশগুপ্ত, মঞ্জুভাষ মিত্র, মতি মুখোপাধ্যায়, অভী সেনগুপ্ত, দেবী রায়, সুব্রত রুদ্র, নির্মল বসাক, অরণি বসু, বীতশোক ভট্টাচার্য, সুজিত সরকার, প্রমোদ বসু, ব্রত চক্রবর্তী, সুবোধ সরকার, সৈয়দ হাসমত জালাল, পঙ্কজ সাহা, মল্লিকা সেনগুপ্ত, চৈতালী চট্টোপাধ্যায়, ঊর্মিলা চক্রবর্তী, সত্যবতী গিরি, পার্থপ্রিয় বসু, অবন বসু, অজিত মিশ্র, দীপক হালদার, শ্যামলবরণ সাহা, নিতাই জানা, জহর সেনমজুমদার, অরুণাংশু ভট্টাচার্য, রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, সুকুমার চৌধুরী, ধীমান চক্রবর্তী, অমিতাভ চক্রবর্তী, সমীরণ মজুমদার, রফিক উল ইসলাম, দীপ সাউ, গৌতম হাজরা, বাপ্পাদিত্য বন্দ্যোপাধ্যায়, কার্তিক দেবনাথ, মেঘ মুখোপাধ্যায়, ইন্দ্রজিৎ সরকার, ক্ষিতীশ দেব শিকদার, অরিজিৎ দাশগুপ্ত, শম্ভু বসু, দিলীপ ভট্টাচার্য, অদ্রীশ বিশ্বাস, অভীক ভট্টাচার্য, দিব্য মুখোপাধ্যায়, দীপঙ্কর গোস্বামী, ভাস্বতী রায়চৌধুরী, নিয়াজুল হক, শ্যামাপ্রসাদ সরকার, খোকন বসু, অর্ণব সাহা, রথীন্দ্র মজুমদার, কেদার ভাদুড়ী, কালিদাস চট্টোপাধ্যায়, কৃষ্ণসাধন নন্দী, চন্দন রায়, সঞ্জয় রায়, অরুণ মুখোপাধ্যায়, গৌতম ঘোষদস্তিদার এবং প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত।

সম্পাদক : প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত

প্রচ্ছদ : মেরিঅ্যান দাশগুপ্ত

প্রকাশক : ডক্টর পার্থ দাশগুপ্ত

মুদ্রক : স্বর্ণাক্ষর

৩১৯/২, নেতাজি সুভাষ রোড, হাওড়া-১

দাম : পাঁচ টাকা

কবিতা, জনপ্রিয়তা, কবিসম্মেলন ইত্যাদি

আগের সংখ্যার সম্পাদকীয়তেই লিখেছিলাম যে, সমস্ত দেশের হৃদয়ের সমর্থন না থাকলে কোনো কবি বিখ্যাত হ'লেও হ'তে পারেন, কিন্তু জনপ্রিয় হ'তে পারেন না। যেমন রবীন্দ্রনাথ ও নজরুল। এই উক্তি আমি প্রত্যাহার ক'রে নিচ্ছি না। কিন্তু সাময়িকভাবে জনপ্রিয় হ'তে পারেন কেউ কেউ—যিনি দশ বছর আগে জনপ্রিয় ছিলেন তিনি এখন হয়তো জনপ্রিয় নেই, কিংবা যিনি এখন কবি হিসেবে জনপ্রিয় তিনি দশ বছর পরে হয়তো জনপ্রিয় থাকবেন না। যিনি সারাজীবন নির্জনতা, নিঃসঙ্গতা, এবং মানুষের সঙ্গে যোগাযোগের কামনা ক'রে কবিতা লেখেন তিনি কখনোই জনপ্রিয় হ'তে পারবেন না—যদিও গুণগ্রাহীদের কাছে তিনি আদৃত হবেন, খ্যাতিও জুটতে পারে একটু আধটু, প্রভাব প্রতিপত্তিও কিছুটা হ'তে পারে। পাঠক বা সম্মেলনের শ্রোতাদেরও দোষ দেয়া যায় না—যা তাৎক্ষণিকভাবে কানের ভিতর দিয়া তাঁদের মরমে পশে না সেই কবিতা তাঁদের ভালো লাগবে কেন? তাহ'লে কবিতার প্রকৃতিই জনপ্রিয়তা বা অ-জনপ্রিয়তার নির্ধারক। পাশ্চাত্যের সব দেশেই কবিতা শোনবার পরে কবিসম্মেলনের শ্রোতারা করতালি দেন (তা-ও একেবারে শেষে), তা পাঁচজন কবিই হোক বা দশজন কবিই হোক। কলকাতা শহরের কবিসম্মেলনে কবি হিসেবে যাবার সুবিধে বা অসুবিধে দুটোই আছে—সুবিধে এই যে, শ্রোতাদের কবিতা ভালো লাগলো বা লাগলো না, তা সঙ্গে সঙ্গে জানা যায়, অসুবিধে এই যে, কোনো বিখ্যাত কবিও যখন কবিতা পাঠান্তে মৃদু করতালি পেয়ে চ'লে যান, তখন—আর কিছু নয়—ঈষৎ ভুল বোঝাবুঝির সম্ভাবনা হয়। শুধু কবিসম্মেলনের করতালি নয়, কবিতার বই-এর ক্রয়-বিক্রয়ও এই কবিতার প্রকৃতির ওপর নির্ভর করে। ঈষৎ উত্তেজনা, একটা গল্প, উপচীয়মান আবেগ, নাটকীয়তা, এই সমস্ত গুণে কবিতায় থাকলে তা সঙ্গে সঙ্গে আদৃত হয়, এবং তার সঙ্গে যদি যুক্ত হয় সাংবাদিকতা। আরেকটি বিষয় আমি এখনও উল্লেখ করিনি—তা হ'লো রাজনীতির নিয়ন্ত্রণ। যিনি মূলত একাকী এবং নিজেকে যোগাযোগ ক'রতে চাইছেন সবার সঙ্গে, তাঁর কবিতা প্রতিক্রিয়াশীল না-ও হ'তে পারে। কিংবা একেবারেই তা নয়। একাকী মানে এই নয়, তিনি মানুষজনকে চেনেন না, বা তাঁর কোনো প্রভাব-প্রতিপত্তি নেই, কিন্তু কবিতা লেখবার মুহূর্তে তিনি একেবারে নিঃসঙ্গ, তার সামাজিক মুখোস তখন খ'সে গেছে, তিনি আবার যুক্ত হ'তে চাইছেন সেইসব মানুষের সঙ্গে যাঁরা ভালোবাসায় ঘৃণায় তাঁর অনুভূতির অধীন হ'তে পারেন। তরুণ

কবিরা অনেকে হয়তো জানেনও না ওপর থেকে কারা দাঁড় নাচাচ্ছে, তাঁরা অনেকে ভালোবাসার যোগ্য, অনেকে ঘৃণার্হ।

আমাদের ক্ষণকালের জীবনদশায় খুব দ্রুত ঘটে যায় সব কিছু—কবিতা লেখা, জনপ্রিয় হওয়া বা না হওয়া, প্রচারিত হ'তে পারা বা না পারা, সব কিছুই। তবু একজন প্রবীণ কবির উক্তির প্রতিধ্বনি করে ব'লবো—কবিতা লেখাই কবির একমাত্র কাজ, অন্য কিছু নয়। কোনো বুদ্ধিমান কবি মাঝে মাঝে ভাবতে পারেন, তিনি একেবারে বোকা হ'য়ে গেছেন, কোনো সাদামাঠা কবির সাফল্যেও অনেকে তাঁকে খুব বুদ্ধিমান ভাবতে পারেন।

পশ্চিমবঙ্গে সাক্ষরতার ক্রমিক হচ্ছে—৩১%, তার মধ্যে আমি কোথায় যেন পড়েছিলাম সাহিত্য পাঠকের ক্রমিক হ'লো ৫%, আর কবিতাপাঠকের ক্রমিক ১% বা তারও কম। এই ১%-এর বাইরে যাঁরা সাক্ষর বা শিক্ষিত অথচ কবিতা কিছুই বোঝেন না, তাঁরা যখন পদ্মবনে মত্ত হস্তীর মতো প্রবেশ করেন তখনই নানাবিধ অসুবিধা দেখা দেয়। পশ্চিমবঙ্গে অনেক তরুণ কবি এখন কবিতা লিখছেন, তাঁরা এ-বিষয়ে অবহিত হ'ন।

২৪ মাঘ, ১৩৯৮

প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত

সম্পাদকীয় দপ্তর : ৩ নর্থ রোড, কলকাতা-৭০০০৩২

লেখা বাকি আছে

'বাবা নদী থেকে ফিরে এলে তবে যাব'
এই কথা বলে সহজ পাঠের ছেলে
কোথায় যে গেল সে কথা জানে না কেউ।

'গিয়ে ভাত খেয়ে খাতা নেব' কথা দিয়ে
গেল আরেকটু খেলে নিতে, তার আগে
'লেখা বাকি আছে' সে কথাও বলেছিল।

বাবা নদী থেকে ফেরেনি এখনো, তার
স্নান সারা হলে আমাদের লেখা শুরু,
আমরা এখন সহজ পাঠের ছেলে।

শেষ দুপুরের আকাশ

জলের পাইপ খাঁ-খাঁ করছে তার ভিতর থেকে
স্বরবিতান তৈরি করছে পাখি—

কল-গার্লের উপরে তার প্রকাণ্ড এক রুগ্ন পরিবার
ভর করেছে তার প্রসাধন কেঁপে গিয়েছে কিছু

রেড-ক্রশের গাড়ির দিকে শয়তানেরা ছুঁড়েছে ডিনামাইট,
আরো তিনটি শিশু মরল, ওরা এখন সংখ্যাও আর নয়।

কারা হঠাৎ গৃহযুদ্ধ বাধিয়ে দিয়ে নিপাট ভালো মুখে
এই কবিতার দ্বিতীয় স্তবকের

নারীকে নিয়ে চড়ুই ভাতি করতে গেল ডায়মন্ড হারবারে ?
শেষ দুপুরের আকাশ এখন লক্ষ করে কাপুরুষতা আমার।

নেই খবর ভালো খবর

দেবশিশু জানালা দিয়ে গলিয়ে দিল আজকের কাগজ

ওসব খবর কিন্তু এখনে ঘটেনি
আমি যেই পড়তে থাকব সঙ্গে সঙ্গে ঘটে উঠবে এরা
জানি না রয়েছে কিনা যুদ্ধ নাকি দাঙ্গা-দুর্ঘটনা

কাগজটা না পড়ে আমি ফিরিয়ে দিই দেবশিশুটিকে

এইভাবেই প্রতিদিন

একই বাড়িতে যাবি। সবাই অচেনা
একশো বাহান্নটা দরজা, প্রত্যেকটি দরজার আড়ালে
অন্য মানুষের গল্প, এতগুলি অজ্ঞাতজীবনী
লিফ্‌টে ওঠে, লিফ্‌টে নামে, ছায়াময় মুখ
প্রশ্ন নেই। তাই কেউ উত্তরও দেয় না। হাসি দিতে হয়
অত্যন্ত নিমগ্ন হয়ে যে যার নিজের নাকের ডগা দেখে।
মাথার পেছনে থাকে আয়না, চক্ষুহীন দেখা
মাখনের মত ঘাড়, চুড়ো বাঁধা চুল, বিদেশী সুগন্ধ
এত ঘনিষ্ঠতা, এত গরম নিশ্বাস, অথচ কেউ কারুর নয়
নামহীন চোখ, পরিচয়হীন হাত, মন-ছাড়া হাসি
এইভাবেই প্রতিদিন, দিব্যি চলে যাচ্ছে
একটুও অস্বাভাবিক মনে হয় না!

যেই রাত্রি আসে

শুধু অবলোকনের প্রান্তটুকু ছুঁয়ে চলে গেলে,
জ্বালানো দুপুর।
এখন তো মধ্যরাত। হঠাৎ কি করে কানে এল
তারই চাপা সুর?

না-লেখা রয়েছে পড়ে সাদা কাগজের মত আলো,
এখুনি লিখবো কি?
জোনাকীর জ্বলা-নেভা অন্ধকারে যে লিপিমালাকে
সাজায় নর্তকী।

কথা জমে উঠেছিল, কথার বরফ জমে আছে।
পাথরের ভাঁজে।
যত গলে পড়ে তাতেই দু হাত ভরে যায়
সকালে ও সাঁঝে।

যাবে বললে, এলে না তো? সত্যিই কি আসবে কোনদিন?
সহসা উধাও।
কিন্তু যেই রাত্রি আসে, নিভে যায় সব সম্ভাবনা
চোখে এসে যাও।

জন্মবৃত্তান্ত

মা-কে নিয়ে আমার খুব গর্ব ছিল।
আমার জন্মের সময় আমি তো জন্মাইনি—
সুতরাং, জন্মদাত্রী বলে নয়।

আসলে
মা খুব গুছিয়ে বলতে পারত
জন্মের গল্প।

মা বলত
সেই জ্যোৎস্নায় ফুটফুটে রাতের কথা,
যখন
আমি আসবো বলে
চাঁদ ঢুকে পড়েছিল আমাদের কুঁড়েঘরে—
আর
কোথা থেকে যেন
একটা চক্রধর সাপ
আমারই মাথার পাশ দিয়ে চলে গেল
ক্ষমা দেখিয়ে।

মা জানত
মানুষের জন্মের কাহিনী
ঠিক কতোটা বললে
সুন্দর হয়।
ঠিক কতোটা বললে
সাপের ছোবলেও ঝরে পড়ে মধু।

সে জন্যে
বেমালুম চেপে গিয়েছিল
রক্তে ভেসে যাওয়া নিজের
সেই যায়-যায় অবস্থার কথা—
নাড়ির ভিতরের যন্ত্রণার কথা।

মা নিজের মৃত্যু দেখেনি।

উঠে দাঁড়াও, নেত্য

তোমার প্রথম পোয়াতি মেয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে দোতলার বারান্দায়,
কুকারে ঘন ঘন হুইশল দিচ্ছে স্টু,
শম্ভু মিত্তির আবার রাজি হয়েছেন
রবীন্দ্রসদনে 'চাঁদ বণিকের পালা' পড়তে—
এমন চমৎকার দিনে
একটেরে ঘরের ভেতর
মুখ হাঁড়ি করে বসে আছো কেন, নেত্যগোপাল !

গতরটা একটু নাড়াও।
সাঁইতিরিশের তোরঙ্গ হাটকে
বার করো গ্যালিস-দেয়া ট্রাউজার্স,
ফোর্ড সায়েবের হাতে তৈরি তোমার টু-সিটার
মুখ থুবড়ে শুয়ে আছে ঘোড়ানিম গাছের তলায়—ওকে জাগাও,
ওর ট্যাংকে পুরে দাও দু-দুটো জাগুয়ার,
আজ সারাদিন
আমরা বেড়াবো বৃষ্টি ভিজবো মদ খাবো
আর জলু বড়ালের মাইফেলে শুনবো
আশ্চর্যময়ী দাসীর গান···
এমন চমৎকার দিনে
চোখে পাথর ঠোঁটে কুলুপ
মুখ হাঁড়ি করে বসে আছো কেন, নেত্যগোপাল ?

ঘুমে কষ্টে জড়ানো সে দিনগুনো

ঘুমে কষ্টে জড়ানো সে দিনগুনো, চকমকি ঘষায় শ্বাসটান দিয়ে ওঠা
এক পোঁচ রাত—সেই ছেঁড়া ঝোলায় জাপটে রাখা চিঠি আর চিঠির ধুলো···
শর-ঘাসওঠা ভূগোল-ক্যালেন্ডার পার হয়ে যায়, শুকনো রেলিঙ মড়মড় করে ওঠে
অপেক্ষাতে—ঘোলা বালুবে হলদে ব্যবধান হয়ে হয়ে উঠছে ঘাম-ঘষটানি।
কী করে জানতে পাও নাম আমার ? দু হাতের ভিজে আমা বালির তলায়
সিসে আর জোনাকির ছররা জুড়োয় পড়ে পড়ে। গেঁথে ছিঁড়ে খসে যাওয়া দিন
পুঞ্জে কালো মাথা ভেঙেচুরে কথা আর কথার ধাঁধাপথ ! বলো,
কী করে জানতে পাও নাম আমার ? চকমকি ঘষায় শ্বাসটান দিয়ে ওঠে
একপোঁচ রাত ! শুকনো রেলিঙ মড়মড় করে উঠছে অপেক্ষাতে—ঘুমে কষ্টে
জড়ানো সে দিনগুনো—ঝোলা ফরফর করে ঝটাপটি করে ওঠে পুরোনো কাগজ···

দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

'অমল গানের বই'

১৭৮৯ সালে ফরাসি বিপ্লবের প্রবল আরম্ভের বছরে লন্ডনের গোল্যান্ড স্ট্রিটের একান্ত বাসাবাড়িতে বসে এক পাগলা শিল্পী তাঁবার পাতে ছবির নক্‌শা আর একটা একটা পদ্যের লেখা খোঁদাই করে নিজের হ্যান্ড প্রেসে ছাপ তুলে তার ওপরে নানা খুশি রঙের পোঁচ বুলিয়ে তুলছেন, এমনি ২৭ খানা ছবি আর লেখার পাতা নিয়ে বই বানালেন একখানা। বইখানার নাম দিলেন 'সঙ্‌স্‌ অফ ইনোসেন্স,' আমরা বাংলা করলুম 'অমল গানের বই'। শিল্পীর নাম উইলিয়ম ব্লেক। রঙ বদলে, লেখার ক্রম বদলে ব্লেক সারাজীবনে সে বইয়ের অন্তত পাঁচিশখানা নকল করেছিলেন বলে আমরা এখন জানতে পেরেছি। কিন্তু জীবনান্ত হওয়ার আরো তিন দশক কাটার পরেও কবি বলে তাঁর খ্যাতি হয়নি, যদিও বিলিতি কবিতার 'রোম্যান্টিক রিভাইভ্যাল' নামে প্রসিদ্ধ নতুন কবিতা আন্দোলনের এই হল প্রথম সিদ্ধ কবিতা—যার শুরুও তাঁরই হাতে, 'পোয়েটিকল্‌ স্কেচেস্‌' বলে তাঁর প্রথম কবিতার বইয়ে, ৩৮ পাতার সে বইখানি ব্লেকের একমাত্র ছাপা বই। কোনো ছবি নেই সে বইয়ে।

'ইনোসেন্সে'র পাঁচ বছর পরে ব্লেক তার লাগোয়া করে দেন তার একখানা দ্বিতীয় ভাগ। পোড় খাওয়া জীবনের অভিজ্ঞতার সে গান 'সঙ্‌স্‌ অফ এক্‌স্‌-পিরিয়েন্স্‌' (১৭৯৪)। সেও একই প্রণালীতে ছবিতে-পদ্যে জোড়কলম করে, কোঁদাই পাতের ছাপ তুলে রঙ দিয়ে তৈরি। তারপর থেকে 'সঙ্‌স্‌ অফ ইনোসেন্স অ্যান্ড অফ এক্‌স্‌পিরিয়েন্স্‌' বলে একখানা বইয়ের মধ্যে সংকলিত হয়ে ওঠে দুখানি বইয়ের লেখা, কিন্তু দুয়ে মিলে সে এক। ব্লেকের ধারণা ছিল দুই বিপরীত ভাব বা অবস্থার যোগে গড়ে ওঠে একটা বিষয়ের গোটা সমগ্রটি—যেমন ভলো আর মন্দের, যেমন এই বইয়ের শিশুদৃষ্টি আর বয়স্কের অভিজ্ঞতার যোগ হলে তবে ব'নে ওঠে পুরো জীবনখানা। তবু বয়সের অভিজ্ঞতার দ্বিতীয় ভাগ সে যেন মন্দের ভাগ ব্লেকের ধারণাতে, না জেনে জ্ঞানফল খেয়ে যেমন নন্দনকানন থেকে আদি নর আদি নারীর পতন হয়েছিল অবাঞ্ছিত দুঃখের পৃথিবীতে সেও তেমনি, ছেলেমি পৃথিবীর স্বর্গ থেকে বারংবহীন সহায়হারা সংকুল ভবিতব্যের মধ্যে আছড়ে পড়া। কিন্তু তার থেকে কারোর, অতি বড়ো নিষ্পাপ শিশুটিরও অব্যাহতি নেই।

দ্বিতীয় ভাগের কথা থাক। কী ছিল গোড়ার বইয়ে, 'অমল গানের বই' খানিতে?

বইয়ের ভূমিকা-কবিতায় দেখতে পাই, আনমনে হালকা আমোদের গান বাঁশিতে বাজিয়ে ঘুরছে একটা লোক, সে হঠাৎ দিবাচোখে দেখল যেন মেঘের ওপর থেকে একটা ছেলে তাকে ডেকে বলছে ভেড়ার ছানাদের নিয়ে যে গান সেইটা বাজাতে। একবার দুবার বাজাতেই জল এসে গেছে ছেলেটার চোখে, সে তখন তাকে বাঁশি রেখে গেয়ে শোনাতে বলছে সুখের আমোদের যত গান তার জানা আছে সেই গান। তারপর বলল, ওই সব গান বসে লেখো, লিখে রাখো যাতে সবাই পড়তে পায়। তখন শর কেটে কলম বানিয়ে, জলে রঙিন কালি গুলে সে লিখছে—

লিখছে রাখাল আর তার গোচারণের মাঠ, আর সাড়া বেজে বেজে ওঠা সবুজে সবুজে খেলার মাঠখানার কথা, ছোট্ট আদর-কাড়া ভেড়ার ছানা, আর কালো মানুষের, চিমনি ঝাড়ুয়াদের দাতব্য ইস্কুলের দুঃখী ছেলেদের কথা, পথহারানো ছেলে আর হারা ছেলে ফিরে পাওয়া মায়ের কথা, বর্ষাবোধনের বাঁশি বাজা বসন্তের আর খুশি উছলোনো ছেলেমি গানের কথা, ছটকটে চড়ুই আর রূপসী বুলবুলের কথা, মায়ের মতো ধাইমা দাসীর উৎকণ্ঠা আর দুদিনের জাতকের জন্ম পাওয়ার আনন্দের কথা, আর সবশেষে কিংবা সবার ওপরে অসহায় শিশুর প্রাণীর, সর্বজীবের জন্য সতত উৎকণ্ঠিত, মানুষের রূপ নিয়ে নেমে আসা দেবতার কথা। যে অমল পৃথিবীটুকু কেবল ছোটো ছেলের সদ্য পাতা বিশ্বাসের ঘেরের ভেতরে আজও অটুট হয়ে চিরজীবী হয়ে রয়ে গেছে—যেখানে মা জাগছেন ছেলের ঘুম আর স্বপ্নটুকু আগলে, জোনাকি জেগে আছে পথহারা কীটের দেখদার হয়ে, দেবতা জেগে আছেন হিংস্র আর অসহায় শ্বাপদের মাঝখানে বরাভয় নিয়ে। একটা ছেলেই কেবল জানতে পায় সে একা নয়, তার সামনে পেছনে পাশে কেউ আছে কেবল তারই জন্যে, কেবল তারই কথা ভেবে। বয়সী মানুষের একমাত্র অভাব এই নিশ্চয় ভরসার।

'ইনোসেন্স' আর 'এক্‌স্‌পিরিয়েন্স'র লেখা যুগ্মভাবে এক মলাটের মধ্যে তৈরি করার পরেও বহুদিন পর্যন্ত ব্লেক কেবল 'ইনোসেন্সে'র কবিতা নিয়ে স্বতন্ত্র বইয়ের নকল তৈরি করে গেছেন—নকল করেছেন চাহিদা পূরণ করতে। চাহিদা বেশি হয়নি তার কারণ এও বটে যে হাতে ছেপে রঙ করে বইয়ের যে খরচ পড়ে যেত, সে শিল্পীর পক্ষে লাভজনক না হয়েও ক্রেতার কাছে দুর্মূল্য।

ব্লেক চেয়েছিলেন তাঁর লেখাটি হবে তাঁর ছবির নকশার একটা ভাগ আর ছবিটি হবে লেখার বিস্তার। সচিত্র লেখার বই নতুন নয়, মধ্যযুগের খৃষ্টীয় ইসলামি পুঁথি অমন অনেক তৈরি আছে, ব্লেকের সময়েও 'এমব্লেম বুক' বলে সচিত্র বইয়ের সমাদর ছিল। কিন্তু ব্লেকের বই সচিত্র পদ্য বা ইলাস্ট্রেশন-জোড়া লেখা মাত্র নয়, একের ফাঁক ভরছে আরটিতে, দুয়ে মিলে তবে সে সম্পূর্ণ। কিন্তু সারাজীবনে তাঁর যাবতীয় লেখার যতটুকু চাহিদা হয়েছে সে কেবলই ছবির কারণে। তাঁর সারাজীবনের পেশাও ছিল ছবিই, লেখাটুকু নিতান্ত সৌখিন মজদুরি। সৌখিনতার জন্য যতখানি মজদুরি করেছিলেন তত শ্রম আর কে কোথায় করেছেন খুঁজে দেখতে হয়। আর সেই সৌখিনতাই এই শতাব্দীর দশকে দশকে বিপুল প্রতিভাধর, অবিস্মরণীয় কবি বলে ক্রমাগত তাঁকে আমাদের চোখের ওপরে বড়ো করে তুলেছে। প্রতিভাবান শিল্পীর যে রচনার পরে আর প্রচারের সময় নেই সেই ভেবে নিজের সম্পূর্ণ অপ্রচারেও ব্লেক সারাজীবন নিরুদ্বেজিত হয়ে ছিলেন। শেক্সপীয়ার কি নিজের লেখা ছাপতে পেরেছেন? মিলটন? কিন্তু ব্লেকের পরিচয় পূর্ণ প্রকাশ পাবার জন্য মরবার পরেও আরো শতবর্ষ সময় লেগে গেল।

ব্লেকের মূল কৌদাই প্লেটগুলি রক্ষা পায়নি। তাঁর ছবি-ছাপার মৌলিকতা আর রহস্য নিয়ে সেই জন্যে অনেক কথা অনেক গবেষণা হয়েছে। তাঁর ক্যালিগ্রাফি বা হাতের লেখা নিয়েও কথা হয়েছে অনেক—ছাপবার জন্যে তিনি কি উলটো হাতে লিখতেন না আর-কোনো উপায় ছিল লেখা কোঁদাইয়ের? আর কোনো উপায় ছিল, এখন জানা। তাঁর দুখানি গানের বইয়ের ('ইনোসেন্স', 'এক্সপিরিয়েন্স') লেখার সুরও হয়তো তিনি দিয়েছিলেন, কেন না তিনি গান গাইতেন, তারও অনেক সাক্ষী আছে। সে সুর আমাদের জানবার উপায় নেই। কয়েক বছর আগে অ্যালান গিন্সবার্গ আর পিটার অর্লোভস্কি (এঁরা বীট্ গোষ্ঠীর কবি, অনেকদিন আগে কলকাতায় এসেছিলেন) 'সঙ্স্ অফ ইনোসেন্স অ্যান্ড এক্সপিরিয়েন্সে'র গানে সুর দিয়ে রেকর্ড করেছেন, জানতে পাই।

ইয়োরোপীয় ভাষার বাইরে এশীয় ভাষাতে 'সঙ্স্ অফ ইনোসেন্সে'র একমাত্র অনুবাদ হয়েছে জাপানি ভাষায়। 'মুজেন নো উতা' নামে মুখোমুখি দুই পৃষ্ঠায় ইংরাজি আর জাপানি কবিতা ছাপা। অনুবাদক বুনশো জুগাকু। ভারতীয় ভাষায় অনুমান করি আমার এই অনুবাদই একমাত্র।

INTRODUCTION

Piping down the valleys wild,
Piping songs of pleasant glee,
On a cloud I saw a child,
And he laughing said to me :

"Pipe a song about a Lamb !"
So I piped with merry cheer.
"Piper, pipe that song again."
So I piped : he wept to hear.

"Drop thy pipe, thy happy pipe ;
Sing thy songs of happy cheer."
So I sang the same again,
While he wept with joy to hear.

"Piper, sit thee down and write
In a book that all may read."
So he vanished from my sight,
And I plucked a hollow reed,

And I made a rural pen,
And I stained the water clear,
And I wrote my happy songs,
Every child may joy to hear.

যেতে যেতে বাঁশি বাজিয়ে বনের পথে
মধু আমোদের যত-না গান বাজিয়ে
দেখি বসে ছোটো ছেলেটা মেঘের পরে,
হেসে সে আমায় বলে ওঠে ডাক দিয়ে :

'বাজাও তো দেখি ভেড়ার ছানার গান।'
বাজাই সে তাই উল্লাসে উচ্ছল।
'ও বাঁশিয়া, ফের বাজাও আরেকবার—'
বাজালুম, তার চোখ ভরে এল জল।

'বাঁশি ফেলে দাও, তোমার সুখের বাঁশি।
গাও সে আমোদ মধুর গানকখানি।'
তাই গাইলুম. আর সেই গান শুনে
আনন্দে কেঁদে ফেলল সে কানাকানি।

'ও বাঁশিয়া, বোসো, পাঁথিখানা ভরে ভরে
লিখে দাও গান সব্বার পড়বার—'
ব'লে তখুনি সে মিলিয়ে গেল আমার
চোখ থেকে। আমি শরবন ভেঙে তার

ফাঁপা শরে গড়ে নিলুম গোঁয়ো কলম,
রাঙিয়ে নিলুম আমল একটু জল,
লিখলুম যত আমার সুখের গান,
শুনে মেতে ওঠে যে গান ছেলের দল।

অরুণকুমার ঘোষ

স্বাধীন কাব্যপাঠের প্রতিবন্ধ

প্রিয় প্রণবেন্দুবাবু,

'অলিন্দ' গ্রীষ্ম সংকলন ১৩৯৮-এ কবি আলোক সরকারের লেখা 'প্রসঙ্গ সুধীন্দ্রনাথ' শীর্ষক আলোচনার কয়েকটি অনুধাবন সম্পর্কে আমার কিছু বলার আছে। কাব্যপাঠে নিরত সহৃদয়, রসগ্রাহী পাঠক তাঁর বোধ ও উপলব্ধিকেই প্রথমত এবং প্রধানত অবলম্বন করবেন। ঐ বোধ ও উপলব্ধিকে আরও স্বচ্ছ ও গভীর করে তোলার জন্য কিছু কিছু বাইরের উপাদানের সহায়তা গ্রহণ করা যেতে পারে। কবির স্বকীয় কাব্যাদর্শ-বিষয়ক বিবৃতি, কবি-প্রদত্ত কবিতার ব্যাখ্যান, কবির স্বকথিত বা স্বলিখিত বা অন্যের লেখা জীবনবৃত্তান্ত, কোনও বিশেষ কবিতার উৎস-নির্দেশক বা পটভূমি-জ্ঞাপক ঘটনা বা অনুভূতির উপস্থাপন—এসব, একজন কবির ও তাঁর কবিতার বৈশিষ্ট্য ও তাৎপর্য উপলব্ধিতে উপরোক্ত পাঠককে সাহায্য করতে পারে। কিন্তু তা বলে সবসময়ই ঐসব উপাদান সমান নির্ভরযোগ্য হয়ে ওঠে না। এমন কি কখনও কখনও তাদের সম্পূর্ণ নিষ্প্রয়োজন বা অবান্তর মনে হতে পারে।

কবি সুধীন্দ্রনাথের একটি বহুল-চর্বিত উক্তি আধারিত হয়ে আছে 'সংবর্ত' কাব্যগ্রন্থের মুখবন্ধে : 'সে যাই হোক, মালার্মে-প্রবর্তিত কাব্যাদর্শই আমার অন্বিষ্ট : আমিও মানি যে কবিতার মুখ্য উপাদান শব্দ ; এবং উপস্থিত রচনা-সমূহ শব্দপ্রয়োগের পরীক্ষারূপেই বিবেচ্য।'—এই উক্তিকে বিনা বিশ্লেষণে, বিনা বিচারে, গ্রহণ করে, জোর করে সুধীন্দ্রনাথকে মালার্মের সঙ্গে একেবারে পুরোপুরি মিলিয়ে দেবার বিভ্রান্ত প্রয়াস চলেছে অনেকদিন ধরেই। দুর্ভাগ্যবশত কবি আলোক সরকারও একই ভ্রান্তির ফাঁদে পা দিয়েছেন।

'সুধীন্দ্রনাথ দত্তের কাব্যসংগ্রহ'-এর 'ভূমিকা'য়'বুদ্ধদেব বসু লিখেছিলেন : "তাঁর কবিতা কোনো দিক থেকেই মালার্মের মতো নয়—তা নয় ব'লে আমি অন্তত খেদ করি না ; ভুল হবে তাঁকে 'সিম্বলিস্ট' ব'লে ভাবলে, তাঁর সঙ্গে মালার্মের একমাত্র সাদৃশ্য দৈববর্জনের সংকল্পে, স্বায়ত্তশাসনের উৎকাঙ্ক্ষায়।"—এই উদ্ধৃতির নিহিত অনুধাবনের সত্যতা সংশয়াতীত। বস্তুতই সুধীন্দ্রনাথ ও

মাল্লার্মের কবিচেতনার সংযোগবিন্দু একটিই, ঐ দৈববর্জনের সংকল্প। দুজন কবিই কাব্যসৃষ্টিতে প্রেরণার গুরুত্ব অস্বীকার ক'রে সচেতন শিল্পপ্রয়াসকে একক মর্যাদা দিয়েছিলেন। ফ্লঁসোয়া কোপেকে মালার্মে একটি চিঠিতে লিখেছিলেন : 'Le hasard n'entame pas un vers, c'est la grande chose.' (এর ইংরেজি অনুবাদ হল : 'Chance does not touch a line of verse, that is the great thing'.) প্রতীকবাদের প্রয়োগে মালার্মের অনুগামী পোল ভালেরিও ঐ লা আজার বা চান্সই মালার্মের একমাত্র বর্জনীয় ছিল বলে সুস্পষ্টভাবে নির্দেশ করেছেন। ভালেরির ধারণায় মালার্মে অবশ্যমান্য করেছিলেন : 'l' eminente dignite de la Poesie, hors da laquelle il n' apercevait que la hasard' (এর ইংরেজি অনুবাদ হল : The eminent dignity of Poetry, outside of which he only saw chance) এই প্রসঙ্গে সুধীন্দ্রনাথের লেখা 'অর্কেস্ট্রা' ২য় সংস্করণ-এর ভূমিকা থেকে পরপর তিনটি উদ্ধৃতি চয়ন করি :

(১) অবশ্য বর্তমানে লেখনীর পক্ষাঘাত সত্ত্বেও স্বপ্নচারী পথিককে যেমন, অনুপ্রাণিত কবিকে আমি তেমনই ডরাই ;

(২) এবং শিল্প সচেতন রূপকারের অভূতপূর্ব সৃষ্টি।

(৩) অন্ততপক্ষে নিপট নৈয়ায়িক ছাড়া আর সকলেই মানবেন যে ব্যক্তিগত অনুভূতির পাণ্ডজন্য অভিব্যক্তি বিপ্রলাপ নয় ; এবং সাহিত্যে ওই অঘটন-সংঘটন মূলত বেদনা ও ভাষার সামঞ্জস্য-সাপেক্ষ।

বলা বাহুল্য উক্ত সমীকরণ একা প্রতিভার কর্ম নয়, অক্লান্ত পরিশ্রম ও নিরন্তর প্রযত্নের পুরস্কার।

—এই একটি ক্ষেত্রে সাধর্ম্য ছাড়া আর একাধিক ক্ষেত্রেই দুই কবিতে প্রকট বৈষম্য লক্ষ্য করা যায়।

প্রতীকবাদীদের আদর্শ ছিলেন জার্মান সুরস্রষ্টা হ্বাগনার। হ্বাগনার যেমন করে মিউজিক্যাল নোটসের প্রয়োগ করে সুরসৃষ্টি করতেন, প্রতীকবাদীদের অভীষ্ট ছিল তেমনি করে শব্দপ্রয়োগে কবিতা সৃষ্টি। প্রতীকবাদীদের মধ্যমণি মালার্মের সাধনা ছিল শব্দশিল্পের শুদ্ধতার ; হয়তো বা অনন্যনির্ভর ধ্বনির প্যাটার্ন বা রূপকল্প সৃষ্টি। 'ক্রন্দসী' কাব্যগ্রন্থের 'বাক্' কবিতায় যদিচ সুধীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন :

'আমার আনন্দ বাকে'

এবং

'মূল্যহীন সোনা হয় তবে স্পর্শে, হে শব্দ অপ্সরী ;'

তবু তাঁর কবিতা চিন্তানির্ভর, বক্তব্যপ্রবণ, সামগ্রিকভাবে সমকাল চেতনায় স্পন্দিত। মালার্মে সাধারণ প্রচলিত শব্দকেই বিন্যাস-স্বাতন্ত্র্যে তুলে দিতে চেয়েছিলেন সৌন্দর্যধ্যান তথা শিল্পসৃষ্টির শুদ্ধতায়। সুধীন্দ্রনাথের কবিতার একটি বৈশিষ্ট্য, অপ্রচলিত আভিধানিক শব্দের বহুল ব্যবহার।

'অর্কেস্ট্রা' দ্বিতীয় সংস্করণের 'ভূমিকা'র শেষ অনুচ্ছেদের প্রথম বাক্যটি হল : 'কখনও যদি লেখবার মতো কথা মানসে জমে তবে তার উচ্চারণ পদ্ধতিও আপনি যোগাবে ; এবং তত দিন আমি বাক্ সংবরণ করলে, আর যার ক্ষতি হোক, বঙ্গসাহিত্য রসাতলে যাবে না।' লক্ষণীয় যে, সুধীন্দ্রনাথের মতে কবিতা সৃষ্টিতে সর্বাগ্রে প্রয়োজন লেখবার মতো কথা অর্থাৎ বক্তব্য বিষয় মানসে জমা ; তবেই অতঃপর তার উপযোগী উদ্ধারণ পদ্ধতি স্বতঃই দেখা দিয়ে কবিতার সৃষ্টি সম্ভব করে তুলবে। কিন্তু এর চেয়ে আরও উন্মোচক উক্তি রয়েছে রবীন্দ্রনাথকে লেখা সুধীন্দ্রনাথের এক দীর্ঘ চিঠিতে। ঐ চিঠির কিছু কিছু অংশ উদ্ধৃত করে দেওয়া যাক্ :

'...আমার মনে হয় কাব্যের প্রধান অঙ্গ lyricism নয়, intellectualism এবং এতেই বিভিন্ন মনের আত্মকীয়তার প্রকাশ। কাব্যে intellectualism আনতে হলে প্রাধান্য দিতে হবে চিন্তাকে। সেই চিন্তাই গরীয়ান যে সমস্ত বাধা বিপত্তি অতিক্রম করে নিজের অবশ্যম্ভাবী লক্ষ্যে গিয়ে পৌঁছয়।...কাব্য জগতে চিন্তার পন্থা পরিষ্কৃত করতে গিয়ে পথের ঋজুতার দিকে দৃষ্টি রাখা বৃথা কেননা তাহলে চিন্তার স্বতন্ত্রতা রক্ষিত হবে না। কবিতা চিন্তার বাহক মাত্র, চালক নয়। কাজেই চিন্তার রাস্তা মোড়বহুল, গতি আঁকা-বাঁকা, পটভূমিকা পরিবর্তনশীল।.....চিন্তার এই গুণ থেকেই গঠনের উৎপত্তি। গঠনের পরিচয় কবিতার পঙ্‌ক্তি বিশেষের মধ্যে নাও পরিলক্ষিত হতে পারে ; কিন্তু একটা কবিতাকে পুরাপুরি নিলে তার মধ্যে একটা ঠাস বাঁধুনি থাকা উচিত।...

'আমার থিয়োরিটা মুখ্যত এই। এর থেকে গোটা কয়েক শাখা-প্রশাখা বেরিয়েছে। যথা : অসাধারণ চিন্তার অভিব্যক্তিতে অপ্রচলিত শব্দের ব্যবহার প্রশস্ত : কেননা এই ধরনের শব্দ মানব মনের অলসগমনের প্রতিবন্ধক। শব্দ বাধায় ঠোক্কর খেয়ে অনেকেই হয়তো ঘরে ফিরবে, কিন্তু তার পরেও যারা এগুবে

তারা অন্তত চলবে চোখ খুলে, কান মেলে প্রতি পদে অগ্র পশ্চাৎ ঊর্ধ্ব অধঃ দেখতে দেখতে।' [দেশ সাহিত্য সংখ্যা ১৩৭৯]

কালের বিবর্তনে সুধীন্দ্রনাথের কাব্যাদর্শ আমূল পরিবর্তিত হয়ে এর একেবারে বিপরীত প্রান্ত ছুঁয়েছে, এ বড়ো বেশী কষ্ট কল্পনা।

ফলত সুধীন্দ্রনাথের কবিতাকে মালার্মের কবিতার মতো শুদ্ধ শব্দ শিল্পমাত্র গণ্য করে কখনই নিরস্ত থাকা যায় না, তাঁর কবিতা দ্যুতিময় হয়ে উঠেছে, বিশ্বজগৎ ও মানব জীবন সম্বন্ধে গভীর চিন্তায়, অভিনিবেশযোগ্য হয়ে উঠেছে, রাষ্ট্রিক দ্বন্দ্বমথিত সমীপ দেশ কালের চেতনায়। 'সংবর্ত' কাব্যগ্রন্থের 'নান্দীমুখ' কবিতায় অব্যবহিত জাগতিক পরিস্থিতিতে ক্ষুব্ধ বিষাদতাড়িত সুধীন্দ্রনাথ বিবেকী দায়বদ্ধতায় আবেগদৃপ্ত কণ্ঠে জানান :

অশক্য পিতা ; বলীর কণ্ঠলগ্ন
মাতা বসুমতী ব্যভিচারে আজ মগ্ন ;
ক্ষাত্র শোণিতে অবগাহি, জামদগ্ন্য
তবু পাতিবে না স্বর্গরাজ্য ভবে।
স্বীয় শক্তিতে হবে যোগ দিতে
শুদ্ধির তাণ্ডবে ॥

'সংবর্ত' নামকবিতায়—

অবশ্য বুঝেছি আজ এ-সিদ্ধান্ত নিতান্তই মেকী ;
কারণ অন্বয় ব্যতিরেকী
সত্য-মিথ্যা, ভালো-মন্দ, সুন্দর-কুৎসিত,
এবং সে-নিত্যবিপরীত
দ্বন্দ্বসমাসের সঙ্গে তুলনীয় মেরু বিপর্যয়
বিকল্প স্বভাব ক্ষেত্রে।

—এই যে নৈয়ায়িক উপস্থাপনভঙ্গীর নিজস্বতা, তা মালার্মে থেকে সুধীন্দ্রনাথকে তর্কাতীত ভিন্নতা দেয়। ঐ কবিতাতেই সুধীন্দ্রনাথের রাজনৈতিক দৃষ্টির ভারসাম্য প্রকাশ পায় এমন অনুধাবনে :

অথচ প্রত্যহ শুনি চার্চিলের স্বেচ্ছাচার বিনা
অসাধ্য সাম্রাজ্যরক্ষা, অব্যর্থ প্রলয়,
এবং যে-ব্যক্তিস্বত্ব সভ্যতার সম্মত আশ্রয়,

তারও অব্যাহতি নেই অপঘাত থেকে :
একা হিটলারের নিন্দা সাধে আজ বাধে কি বিবেকে ?

'১৯৪৪' কবিতায় উদ্ভাসিত সুধীন্দ্রনাথের আশ্চর্য রাজনৈতিক দূরদৃষ্টি :

তবু জানি যবে জয় হবে বলেছিলে,
চাওনি তখন তুমিও এ-পরিণাম :
শূন্যে ঠেকেছে লাভে লোকসানে মিলে,
ক্লান্তির মতো, শান্তিও অনিকাম।
এরই আয়োজন অর্ধশতক ধ'রে,
দু-দুটো যুদ্ধে, একাধিক বিপ্লবে ;
কোটি কোটি শব পচে অগভীর গোরে,
মেদিনী সুখের এক নায়কের স্তবে !

অরুণকুমার সরকারকে লিখিত সুধীন্দ্রনাথের একটি পত্রের যে আংশিক উদ্ধৃতি দিয়েছেন আলোক সরকার, তাতে উক্তি ও উপলব্ধির অদ্বৈতেই সুধীন্দ্রনাথের প্রত্যয় ব্যক্ত হয়, কবিতাকে শুদ্ধ শব্দ শিল্পমাত্র গণ্য করাতে নয়। 'অর্থাৎ কাব্য রচনা শব্দসাপেক্ষ এ-কথার মানে এমন নয় যে সে-জন্যে ব্যাকরণের বিধি-নিষেধ, অথবা ভাবনার পরিণতি বর্জনীয়, তার তাৎপর্য শুধু এই যে কবিতার উক্তি ও উপলব্ধি অভিন্ন, তাতে অপরিপক্ক ধারণার স্থান নেই, এবং ভাষার সঙ্গে একেবারে মিশে না যাওয়া ভাব ভাবুকের আয়ত্তে আসে না।' ভাব ও ভাবনা কবির কল্পনা ও অনুভূতিতে পরিপূর্ণভাবে আত্তীকৃত হয়ে ভাষার সঙ্গে সম্পূর্ণরূপে মিলেমিশে যাবে তর্কাতীত অনুধাবন। আর এখানে 'ভাবনার পরিণতি'-র প্রসঙ্গ উত্থাপনও বিশেষভাবে লক্ষ্য করার মতো। ঐ এই উদ্ধৃতিতে মালার্মে সম্বন্ধে যে রয়েছে : 'তাহলেও তার শ্রেষ্ঠ কাব্যের সার্থকতা প্রায় অতুলনীয় বোধহয় এই কারণে যে তাতে চিন্তা অভিপ্রায়ের সেবক ; এবং যে বিশ্বাসে, বা অবিশ্বাসে তার লেখা বদ্ধমূল, তা কায়মনোবাক্যের অবৈকল্যে সঞ্জীবিত ব'লেই, তাঁর বক্তব্য একবার ধরতে পারলে, তাতে যেন প্রমিতির আভাস মেলে।'—লক্ষণীয়, মালার্মের কবিতায় সুধীন্দ্রনাথ খুঁজে পেয়েছেন, 'চিন্তা' 'বিশ্বাস বা অবিশ্বাস'। 'বক্তব্য' ও 'প্রমিতি'। স্পষ্টতই এখানে সুধীন্দ্রনাথ মালার্মের কবিমানসতার ওপর নিজের কবিমানসতাকে আরোপ করেছেন।

মেলাবেন, তিনি মেলাবেন

মালার্মের সঙ্গে সুধীন্দ্রনাথকে জোর ক'রে মিলিয়ে দেবার তাগিদে শ্রীআলোক সরকার একজায়গায় সুধীন্দ্রনাথের উক্তির ওপর বাইরে থেকে অর্থ আরোপ করেছেন। কাব্যাদর্শের দিক দিয়ে মালার্মের সঙ্গে নিজের সাযুজ্য-প্রতিপাদক সুধীন্দ্রনাথের উক্তির পূর্বোদ্ধৃত অংশের পরেই রয়েছে : 'ছন্দে শৈথিল্যের প্রশ্রয় না দিয়ে, লঘু-গুরু, দেশী-বিদেশী, এমনকি পারিভাষিক শব্দও আচরণীয় কিনা, সে অনুসন্ধানও হয়তো কোনও কোনও কবিতায় রয়েছে, এবং শব্দ ও ছন্দ উভয়ই যেহেতু পরজীবী, তাই বর্তমান শব্দবিন্যাস ও ছন্দোব্যবহারের ভূমিকা লেখকের ভাবনা-বেদনা যার বহিরাশ্রয় আবার ইদানীন্তন ঘটনাঘটন।'—এর এইভাবে ব্যাখ্যা করছেন শ্রীআলোক সরকার : 'অর্থাৎ পরজীবী ছন্দ ও শব্দ দায় (দায়ে ?) পড়ে আশ্রয় হিসেবে অবলম্বন করেছে লেখকের ভাবনা-বেদনাকে, যার বহিরাশ্রয় তদানীন্তন ঘটনাঘটন। সুতরাং সংবর্তের কবিতাবলীর রসাস্বাদনের প্রয়োজনে তা অর্থাৎ লেখকের ভাবনা-বেদনা, তদানীন্তন (ইদানীন্তন ?) ঘটনাঘটন একান্ত ভাবেই যে অকিঞ্চিৎকর তা বুঝতে অসুবিধে হয় না।' 'দায়ে পড়ে' এবং 'একান্তভাবেই যে অকিঞ্চিৎকর তা বুঝতে অসুবিধে হয় না।'—এই দুটি অংশেই সুধীন্দ্রনাথের উক্তির ওপর অনভিপ্রেত দ্যোতনা আরোপ করেছেন শ্রীআলোক সরকার। কবিতায় লেখকের ভাবনা-বেদনা ও তার বহিরাশ্রয় ইদানীন্তন ঘটনা-ঘটনকে একেবারে তুচ্ছ করে সুধীন্দ্রনাথ কখনই ছন্দ ও শব্দকে এইভাবে স্বরাট্, স্বমহিম রূপে উপস্থিত করেননি। দুই কবিকে মিলিয়ে দেবার একই ক্লিষ্ট প্রয়াসে শ্রীআলোক সরকার মালার্মে-সম্বন্ধীয় সি. এম. বাওরার অনুধাবনকে সুধীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য বিবেচনা করেছেন। মালার্মের পরিজ্ঞাত ছিল ভাবনাতীত বচনাতীত যে নান্দনিক আনন্দের পরমতা সুধীন্দ্রনাথ নাকি শব্দ শৃঙ্খলা ও ধ্বনির উজ্জীবনের ভিতর দিয়ে সেই রহস্যকেই স্পর্শ করতে চেয়েছিলেন! বাওরার দৃষ্টিতে মালার্মে আয়ত্ত করার অভিলাষ করেছিলেন তাঁর যে আদর্শকে তা হল : "L'absence", the perfection which is never actually present, the silence which is more musical than any song." শ্রীআলোক সরকার বলেছেন : 'সংবর্তের কবিতা যদি আমরা প্রতিটি শব্দ কেবল উচ্চারণ করে নয় তার সর্বাত্মিক ব্যাপ্তি ও অমূর্ত ধ্বনির নিমগ্নতায় পাঠ করি, আমার মনে হয় সেই "L'absence" অনুপস্থিত পূর্ণতার স্পর্শ আমরা পেতে

পারি।' সুধীন্দ্রনাথের 'সংবর্ত' কাব্যগ্রন্থের নিবিড়ভাবে সমকালসংলগ্ন কবিতা-বলীতে কেউ যদি খুঁজে পান যে কোনও সঙ্গীতের চেয়ে অধিক সুরময় স্তব্ধতাকে, তাহলে তাকে মগ্ন অন্তর্মুখী এক মনের সুস্পষ্ট আরোপ বলেই গণ্য করতে হবে।

ঠিক-বেঠিকের সাদা-কালো ছক

কবিতাসৃষ্টির ক্ষেত্রে টি. এস. এলিঅট জোর দিয়েছিলেন আত্মসচেতনতা তথা নিরাবেগ নৈর্ব্যক্তিকতার ওপর। সেই-সম্পর্কিত তাঁর একটি বহুশ্রুত উক্তি উদ্ধার করে শ্রী আলোক সরকার সুধীন্দ্রনাথের যাবতীয় কবিতার প্রসঙ্গেই তার সমান প্রযোজ্যতার কথা বলেছেন। তারপর তিনি জানিয়েছেন ; '……সুধীন্দ্র-নাথের কাছে চিরদিনই আধার আধেয়ের অগ্রগণ্য এবং এই উক্তির ভিতর যেহেতু কেবল বিষয় নয়, বিষয়ীরও অপ্রাধান্য ঘোষিত হয়েছে, অন্তত সুধীন্দ্রনাথের কাব্যপ্রয়াসে, কাব্যাদর্শে আবেগ, ব্যক্তিগত আবেগের প্রশ্নই ওঠে না। এবং লক্ষ্য করলে বোঝাই যায়, আমার অন্তত বুঝতে অসুবিধে হয় না, সুধীন্দ্রনাথের কবিতায় ব্যক্তিগত আবেগও আধেয় মাত্র, পরজীবী আধার নিতান্ত দায়ে পড়ে তাকে অবলম্বন করেছে।"—এখানেও দেখি অনভিপ্রেত তৎপর্যের আরোপে ক্লিষ্ট ব্যাখ্যানপ্রয়াস। আর 'নিতান্ত দায়ে পড়ে' অংশটুকুতে তার সোচ্চার প্রকাশ। এরপর এলিঅটের দুটি উদ্ধৃতি তুলে সুধীন্দ্রনাথের কাব্যসৃষ্টি ও তার আলোচনায় তাদের প্রযোজ্যতা প্রদর্শন করে শ্রীআলোক সরকার চলে এসেছেন জীবনানন্দের 'সমারূঢ়' কবিতার প্রসঙ্গে। কবিতাটির মর্মার্থ উপস্থাপন করেছেন তিনি এইভাবে : 'জীবনানন্দ আক্ষেপ করেছিলেন অধ্যাপক সমালোচক কবিতার পাণ্ডুলিপি ভাষ্য টীকা ইত্যাদির বিশ্লেষণ করে প্রচুর অর্থ উপার্জন করেন, জানেন না, তাদের মনেও পড়ে না এইসব কবিতার রচয়িতা কবি কী দুঃসহ যন্ত্রণার জীবন যাপন করেছিল, কত বেদনাতুর জীবন ছিল তাদের।' আর তারপরই বেশ প্রত্যয়ের সুরে তিনি সিদ্ধান্ত করেছেন : 'এলিয়ট নিশ্চয়ই বলবেন, আমরাও বলবো, জীবনানন্দ ভুল করেছিলেন। সমালোচনায় কবির ব্যক্তিগত উপস্থিতির প্রশ্ন অকিঞ্চিৎকর।' জীবনানন্দ উক্ত 'সমারূঢ়' কবিতায় সম্ভবত বলতে চেয়েছেন : আবেগ-অনুভূতিবর্জিত, নিরুত্তাপ, অধ্যাপক-সমালোচক তাঁর নীরস ধ্বংসের দৃষ্টিতে কবিতাকে এক কবির সজীব স্রষ্টৃসত্তার প্রাণবেগে স্পন্দিত

সৃষ্টিরূপে গ্রহণে অক্ষম। তিনি তাকে একটি শবদেহ হিসেবে গণ্য ক'রে তারই ব্যবচ্ছেদে নিয়োজিত হন। তাই তাঁর সমালোচনায় তিনি উদ্দিষ্ট কবিতায় রূপায়িত কবির অভিজ্ঞতা-আবেগ-অনুভূতি-কল্পনাকে, কবির তীব্র কামনা, সংরাগ, অন্তর-আলোড়নকে গভীরভাবে উপলব্ধি করতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ। 'এস্‌কেপ ফ্রম পার্সোনালিটি'-র মৌল তাৎপর্য প্রকাশের নৈর্ব্যক্তিকতাতেই নিহিত। কবি তাঁর অভিজ্ঞতা-আবেগ-অনুভূতি-স্মৃতি-ভাব-ভাবনাকেই তাঁর কবিতায় রূপ দেবেন। ঐ অভিজ্ঞতা-আবেগ-অনুভূতি ইত্যাদি বাইরের বিশ্বজগৎ ও মানবজীবনকে আশ্রয় করতে পারে, কখনও অবলম্বন করতে পারে কবির ব্যক্তি জীবনকে, তাঁর ব্যক্তিসত্তাকে। তবে তার প্রকাশ সর্বদাই হবে নৈর্ব্যক্তিক, তাতে ব্যক্তিকতার শৈথিল্য, প্রাবল্য, সংকীর্ণতা একেবারে থাকবে না।

কবিতা কবির ব্যক্তিজীবন ও আবেগ-অনুভূতির দর্পণ বা কবিতা এবং কবির ব্যক্তিজীবন ও মনোজীবন ঋজু ও সরল কার্যকারণ সূত্রে বিধৃত এমত সরলীকৃত ধারণার বশবর্তী না হয়েও বলা যায়, একটি কবিতার সৃষ্টি উৎসে কবির ব্যক্তিজীবনের কোনো ঘটনার স্মৃতি! কোনো ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা, কোনো পরিস্থিতি বা পরিবেশের মানসিক প্রতিক্রিয়া, কোনো ক্ষণের তীব্র আবেগ-অনুভূতি থাকতেই পারে, কিন্তু তারা উক্তি ও উপলব্ধির অদ্বৈতে এমন গলে মিশে যায় যে ঐ রূপান্তরিত অবস্থায় তাদের সনাক্ত করা প্রায় অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। তবু কবিতার সৃষ্টি উৎসের এই প্রাণনাটুকুকে কি একেবারে তুচ্ছ করা চলে? 'শাশ্বতী' কবিতায় বিদেশের মাটিতে স্বর্ণ কেশিনী ('চিকুরের পাকা ধানে') নীলনয়না ('নীল তার আঁখিসম') বিদেশিনী প্রেমিকার আসঙ্গ-স্মৃতি ক্রিয়াশীল হয়ে ওঠেনি? 'সংবর্ত' কবিতায় 'সে' এই সর্বনামের আড়ালে কোনো জীবন্ত মানবীয় প্রেমের স্মৃতি সত্যিই নেই?

জীবনের সার কথা পিশাচের উপজীব্য হওয়া,
নির্বিকারে, নির্বিবাদে সওয়া
শবের সংসর্গ আর শিবার সদ্‌ভাব।
মানসীর দিব্য আবির্ভাব,
সে শুধু সম্ভব স্বপ্নে, জাগরণে আমরা একাকী;
...নরক, ক্রন্দসী
আর্তনাদ ছাড়া আজ নৈবেদ্যের যোগ্য কিছু নেই॥
—উজ্জীবন, সংবর্ত

অতএব কারও পথ চেয়ে লাভ নেই:
অমোঘ নিধন শ্রেয় তো স্বধর্মেই,
বিরূপ বিশ্বে মানুষ নিয়ত একাকী।
—প্রতীক্ষা, দশমী

—এ সব কার উপলব্ধি, বিশ্ববীক্ষা তথা জীবনদর্শনের প্রস্ফুরণ? 'উটপাখী' কবিতায় বাস্তববিমুখ, আদর্শবাদী, মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবীর আত্ম-সমালোচনা প্রকাশিত হয়নি? 'অন্ধ হলে কি প্রলয় বন্ধ থাকে?'—অমোঘ, ভয়াল এক দৈববাণীর মতো উচ্চারিত এই কাব্যপঙ্‌ক্তিতে কার গহন সত্যোপলব্ধি মন্দ্রিত?

.....আমি বিংশ শতাব্দীর
সমানবয়সী; মজ্জমান বঙ্গোপসাগরে; বীর
নই, তবু জন্মাবধি যুদ্ধে যুদ্ধে, বিপ্লবে বিপ্লবে
বিনষ্টির চক্রবৃদ্ধি দেখে, মনুষ্যধর্মের স্তবে
নিরুত্তর, অভিব্যক্তিবাদে অবিশ্বাসী, প্রগতিতে
যত না পশ্চাৎপদ, ততোধিক বিমুখ অতীতে।
—যযাতি, সংবর্ত

আমি ক্ষণবাদী: অর্থাৎ আমার মতে হয়ে যায়
নিমেষে তামাদী আমাদের ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষ, তথা
তাতে যায় জের, সে-সংসারও।
—উপস্থাপন, দশমী

এ কার আত্মবিবৃতি তথা স্বীকারোক্তি? কার জাগতিক প্রত্যয় ও দার্শনিক প্রতীতি এ দুটি কবিতাংশে পরিস্ফুট হয়েছে? এ সব ক্ষেত্রে কি মনকে চোখ ঠেরে মুখচ্ছদ বা মাস্কের প্রয়োগ হয়েছে বলে ভজাতে হবে? 'সুধীন্দ্রনাথ দত্তের কাব্যসংগ্রহ'-এর পূর্বোক্ত 'ভূমিকায়' বুদ্ধদেব বসু, সুধীন্দ্রনাথ বাংলা কবিতায় 'ধ্রুপদী রীতির প্রবর্তক'—এই বহুল উচ্চারিত মন্তব্যের প্রতিবাদ করে তার বিপরীতে স্থাপন করেছিলেন—সুধীন্দ্রনাথ মর্মে-মর্মে রোমান্টিক কবি, এবং একজন শ্রেষ্ঠ রোমান্টিক, তাঁর এই ধারণাকে। একটু সূক্ষ্মির পর্যালোচনে এই দুই ধারণাকে পরস্পর বিপরীত কখনই মনে হবে না, মনে হবে পরস্পরের পরিপূরক ব'লে। সুধীন্দ্রনাথ বাংলা কবিতার রীতির দিক দিয়ে প্রথম ধ্রুপদী, মর্মগত দিক দিয়ে বা অন্তর্গত ভাবের দিক দিয়ে রোমান্টিক। এই ভাবগত রোমান্টিকতার মৌল লক্ষণ তাঁর কবিতায় ব্যক্তিগত স্মৃতি, বেদনার্তি, উপলব্ধি, দার্শনিক ভাবনার এই প্রকাশ।

হলকা

যাই বা তোমার কাছে কী সব অস্বস্তিকর দিন
রাত ধু ধু আগুনের, শুনি শুধু ; আমাকে দেখুন।

আসেন তরুণ বন্ধু বলে যান : লেখা ছাড়েন নি তো ?
কী কথা জানাই ভেবে হঠাৎ ফিরিয়ে মুখ দেখি

প্রেমিক-স্কুটার ঘুরছে বনঘন প্রেমিকার ঘরের চারপাশে
গলি জুড়ে শুখ নাচ ভেতরে মানুষ জবুথবু।

ভালোবাসা কাকে বলে আজও সত্যি কিছুই জানি না
শুনেছি দিনের বাণী : কোপাও, কুপিয়ে মারো পথে !

দেখা

চোখ বন্ধ করো আর কী বা তুমি দেখতে পাচ্ছো বলো
আমি দেখি তাস আর একশোর বান্ডিল।

চোখ বন্ধ করো আর তুমি কী বা দেখতে পাচ্ছো বলো
আমি দেখি নারী আর বুকের কলস সুধা নারী।

চোখ বন্ধ করো আর কী বা তুমি দেখতে পাচ্ছো বলো
ভাই, আমি দেখি শুধু শেষের সেদিন।

চোখ বন্ধ করো তুমি কী বা দেখতে পাচ্ছো বলো
আমি দেখি ভাঁজ খুলছে, ভাঁজ খুলছে রুপোলি পৃথিবী।

প্রক্ষিপ্ত প্রহর

একদিন ভোরবেলা দেখি
পৃথিবীর সব নারী সবকিছু এমনকি তাদের শিশুদেরও
ফেলে রেখে
কোথায় চলে গিয়েছে
ওরা কি দেবী হয়ে গেলো
তারা কি সঙ্গে স্নানঘর সমুদ্র কুয়াশা বর্ষাকাল ঘাস
বাসস্টপ জানালা ছাদ নীল কাগজ নিয়ে গেছে
এই ভেবে আমি পিছনে ছুটতে থাকি।
সেখানে পরিত্যক্ত মন্দির ভাঙাভগ্ন মূর্তি মরা-শামুক ভর্তি মাঠ
আর একটা বয়সহীন অশথ গাছ
ধারে কাছে আলোক সরকারের বাড়ি নেই

আমি সামনে ছুটতে থাকি
পরশুরাম সান্দাম হুসেন বুশ বানতলা
সব মাথা নিচু ক'রে আছে
সুচেতনা-নামক একটা কবিতার টুকরো পেয়ে যাই
মাথার উপর তখন মে-মাসের প্রখর রোদ
আর একটা মরা অশথ গাছ
আলোক সরকার কি বরাবরের জন্য এখান থেকে চলে গেছেন।

ছোটরা যখন

তুমি কে আমি জানি না, শুধু জানি
আমার ছেলে তোমাকে ভালোবাসে
ছোটরা যখন কাউকে ভালোবাসে
বড়দের দায়িত্ব যায় বেড়ে।

আমার দায়িত্ব ছিল পুরনো এই বাড়িটা
ঠিকঠাক রাখা, তবু
পলস্তরা যায় খসে,

কত যে উঠোন, আর কত যে সিঁড়ি
তারই হিসেব রাখিনি কোনওদিন
সোঁদা গন্ধে ভরে যায় ঘর।

এরই মধ্যে আমার ছেলে তোমাকে ভালোবাসল।
তুমি এসে দেখবে,
পুরনো বাড়ির অন্ধকার ঘরগুলোয়
হিরের মতো জ্বলছে এক একটা আয়না,
পুরনো দিনের বাতাস স্তব্ধ হয়ে আছে ইঁদারায়।
ওরা এতদিন অপেক্ষা করছিল,
কখন বুকে ধরবে তোমার মুখের ছবি
ওরা খুশি হল তোমাকে দেখে,
হাসল।

মুখ ফুটে কিছু বলার আগেই
মনের কথা বুঝতে পারে যূথিকা।
"কেমন সুন্দর এই বুকদুটো, ছুঁয়ে দ্যাখো—"
যূথিকা বলেনি, বলবেও না কোনওদিন
আমিই শুধু কিছু বুঝতে পারি না।

পাপড়ির মতো আস্তে আস্তে
শুকিয়ে আসছে শরীর।
যূথিকা বলেনি, আমিও কখনও
ওকে বোঝার চেষ্টা করিনি।

যূথিকা কিন্তু সব জানে।
আমি কিছু বলি বা না বলি
সে সব বুঝতে পারে।
ছিন্নভিন্ন এই শরীরটাকে সেলাই করে
সে-ই তো এনে দাঁড় করিয়ে
দিয়েছে এই মাঠের মাঝখানে।

অভী সেনগুপ্ত

যাদু সভাঘর

কারা গড়েছিল নারীপুরুষের যাদু সভাঘরগুলি
কারা ভেসেছিল কবিতায়, সঙ্গীতে
ডাকাবুকো পথ দিনযাপনের বেমালুম অবসরে
ডাক দিয়েছিল ঠাঁঠা রোদে, মেরুশীতে

যেমন সহজ সর্বনাশের প্রাণ হাতে পায়ে ঝুঁকি
জেনে নেয় দ্রুত কাহিনীর সন্তান
দরাজ গলার অলৌকিকের মুখরায়, বিদেশে
মশগুল আজ দিগ্বিজয়ের গান

তাহলে বলছো, আগুন জ্বালানো নেশাধিকিধিকি বোরে
ধ্বংসস্তূপে রেখে আমি যত ভয়
জেলো পিছুটানে চেনাদিগন্ত পেরোতে ভাবুক ওরা
অন্য নিয়মে বেবাক যাদের ক্ষয়

আমাদের যত যাদু সভাঘর মুখর থাকছে, দ্যাখো
বাকী মিলেমিশে আলো ফেলে দরজায়
ক্যামেরাপুরুষ এই এলো ব'লে, দাঁড়াও আমার কাছে
সুন্দরী শোনো, সুসময় চ'লে যায়।

যে এসেছে

অনেক প্রবাস ঘুরে ভালবেসে স্মৃতির সুবাস
এই দিন টেনে নিল তার অন্য দিনের আভাস
খুলে রেখে হরিণীর সাজ
যুগ পার ক'রে সে এসেছে আজ
সমতলে উৎরাই ও চড়াই
একা মানুষেরা যেভাবে ডিঙিয়ে যাই
সেতুর খবর দিয়ে
শীতাতপ আরও কিছু নিয়ে
এক বাক্যে সে এসেছে সুস্থির জানাতে

ঠিক ঠিকানায় ছিল প্রেম অবাধ শরীরী রাতে।

স্বপ্নের ভিতর—বারান্দায়

উন্মাদনা, ঠাণ্ডা মাথায় কিছুই ভাবতে পারি না আর
সেই পাখির ঝাঁক যারা দিক চক্রবালে হারিয়ে যায়
ম্যাসানজোর ড্যামে দাঁড়িয়ে আর একবার প্রত্যক্ষ
করা গেল—

জোড়ায় জোড়ায় টিয়াপাখি এ গাছ ও গাছে
সেই পাখিটিকে কি খুঁজে পেলে ? যে তোমার
স্বপ্নের ভিতর—বারান্দায় উড়ে এসে বসে—
টুই টুই করে সিস দিয়ে পুনরায় উড়ে যেতো।

হৃৎ-কেন্দ্রের ভিতরে

আকাশে চাঁদ। শান্ত, ঘুমন্ত-পথ। ছাদের কার্নিশে
কবুতরের ডাক·····

হৃৎ-কেন্দ্রের ভিতরে রয়েছে সে, কতোদূরে—ঠিক কতোদূরে
এক চিলতে হাসিমুখের জাগতিক-প্রেরণা ;

আপাদমস্তক এক যন্ত্রণা নিয়ে নিরুত্তেজ শুয়ে আছি
কেউ ফিরেও তাকায় না।

অন্য বরাভয়

মাথার ভেতরে
বোধ নয়—
দ্রোহহীন ভ্রান্তি সব শুধু বাস করে।
চোখে তাই ধ্বংস চাহনি
প্রচুর দুর্গন্ধ ঘেঁটে
দু'হাতে ভরতে চায় আদর্শের শূন্য পাত্রখানি।

বুঝেও বোঝে না ওরা
জেনেও জানে না,
প্রস্তর বিচূর্ণ করে হাঁটে যারা
তাদের দমিত করে
পৃথিবীতে এ-রকম নেই কোনও সেনা।
লেনিন পতিত দেখে
যাদের দু'চোখ থেকে মুছে গেছে ঘুম।
জেনেও বোঝে না তারা
বারুদ পারে না বুক্ষে ফোটাতে কুসুম !

বাসনার তৃপ্তি নেই ।
বুকের ভেতরে
তৃষ্ণার্ত পাখিরা সব
প্রতিদিন স্বপ্নময় যেতে চায় উড়ে।
ক্লেমলিনে বার্লিনে তাই
আজ মনে হয়—
অন্য এক প্রতিধ্বনি
বোধের ভেতর থেকে উৎসারিত অন্য বরাভয়।

উপত্যকার পথে

কোথাকার কোন্ ঝরণার জল
পাহাড়ী পথের এক পাশে প্রবল বেগে ছুটে চলেছে
বারবার বাস থেকে নেমে দেখছি তুষার শুভ্র শৃঙ্গমালা
ক্রমশ, ক্রমশই এগিয়ে আসছে
কাছে, আরো কাছে
পোখরা ভ্যালি নারীর মতো সস্নেহে কোল পেতে দু'হাত
আমার দিকে, আমারই দিকে
আঁধার হয়ে আসছে আঁধার চরাচর জুড়ে কী স্তব্ধতা
দূরে, বহু দূরে সূর্যাস্তের আলো মিলিয়ে যাচ্ছে
কে কাঁপে, কে কাঁপে গহন রক্তে
হে নির্জনতার দেবতা, তুমি তো জন্ম থেকেই আমার বুকে
নিঃশব্দ সুরের বীণ বাজিয়ে চলেছো
রঙ-রেখায় কত মানুষের চোখে-মুখে কী বিচিত্র লীলার মগ্নতা
কথা বলিনি আমি কতদিন প্রবাসী আজ তার সঙ্গে
দূরের পাহাড়, তুমি কি জানো, কী নিঃসঙ্গতা
আমার ঘর বাঁধা হয়নি
জলের নুড়ির শব্দে, নারী, তুমি কতকাল আর আমায়
শুধু, এই পথ, চলা, চলার
হে গতি, আমাকে বাঁধো দুটি হাতের মুঠোয়
চুমুকে চুমুকে পান করে যাবো তৃষ্ণার অঞ্জলি
হে অন্নপূর্ণা, তুষার চূড়া আমাকে জড়াও, জড়াও
নিভে যেও না, নিভে যেও না
আরো, আরো একটু কাল
আজন্ম এই অতৃপ্তির অন্ধকার জ্বলে উঠুক দপদপ জ্বলে উঠুক
ডুবন্ত সূর্যের আগুনের শিখায় !

বানরুটি

১৭ই জুন রোববার
রোববার সকালে জনসমক্ষে দু'ভায়ের ফাঁসি হয়ে গেলো ।
ঠিক সে সময়ে ঝড় উঠলো, আর দুই ভাই দোল খেতে খেতে
ফিসফিস করে বলতে লাগলো :
মানুষগুলো কি বোকা ! মানুষগুলো···

কী করেছিলো দু'ভাই ? কিছু না । শুধু
মাংসগুলো মাটি হয়ে যাচ্ছে, দেখে
কবরখানায় গিয়ে, খুঁড়ে, থাই, পাছা, মাই
চুপিচুপি তালতাল কেটে নিয়ে এসে মৌরি ।
শুধু মৌরি নয়, মেথি, কিছুটা জিরেও, ভাজা ।

ইটালিয়ান কুইজিনির ব্যাপারস্যাপার, যাক্
তারচেয়েও যে ভালো চাইনীজ, ওরা জানতো, তাছাড়া, মেধা
বলে তো একটা বস্তু আছে, আইডিয়া,
কতটুকু শুকনো লংকায় কতটুকুই বা নিমক,
ঝাঁঝঅলা সরষের তেলে গ্রাইন্ড না ক'রে, পিষে

শুধু পিষে নয়, ভেজে, অল্প আঁচে ভেজে
পুর দিয়ে 'বানরুটি' সস ও সালাডে
যখন পরিবেশন করতো নিজস্ব দোকানে, 'গুলমোহর'
তারিফ উঠতো হেভী, ঘুচে যেতো দারিদ্র্য, আনন্দে
লাল সূর্য মাথায় করে নাচতো দু'বেলা ।

চেলাকাঠে বাড়ি খেয়ে ১৭ই জুন, রোববার
রোববার সকালে জনসমক্ষে দু'ভায়ের ফাঁসি হয়ে গেলো ।
ঠিক সে সময়ে ঝড় উঠলো, আর দুই ভাই দোল খেতে খেতে
ফিসফিস করে বলতে লাগলো :
মানুষগুলো কি বোকা ! মানুষগুলো···

কালিদাস চট্টোপাধ্যায়

খোলা জানালায়

বিষণ্ন জানালা যেন খোলা থাকে, নগ্ন হয় মূল
নৌকা এসে দাঁড়ায় সেখানে।

জলের বিদীর্ণ গানে ভরে ওঠে সমুদ্রসমাজ,
সমূহ অত্যন্ত টানে ; ছিঁড়ে যায় আত্মপ্রতিকৃতি ··
আদিম বাহুর মত অকরুণ আগুন জ্বলেছে—
সমুদ্রিত শহরের স্তম্ভিত বাগানে, শয্যালয়ে।

পুরোনো পোশাকের মত আমাকে পুনরায় ব্যবহার করো.;
পর্ণমোচী বনে গত বসন্তের রক্তিম ফেনা উড়িয়ে এখন
যাবতীয় দ্রোহ আর প্রচেষ্টায় উপভোগ্য তুমি—
প্রিয় গুহাপথ ধরে উড্ডীন নৌকার কাছে যাও।

বিষণ্ন জানালা আজও খোলা আছে, নগ্ন সেই মূলে
অদ্ভুত জলের মত দু'টি বাহু বাড়িয়ে দিয়েছ।

ছায়াবাণিজ্য

আধভাঙা থামের ছায়ার নিচে
অনেক ছায়ার বাণিজ্য চলেছে ;
তুমি এই আর্তনাদ ও জ্যোৎস্না
হয়তো আমাকে দেবে।

জটিল শিশুরা নীরবে রয়েছে
পুরুষ জাগছে রাতে, ঘুম নেই ;
ক্লান্তির ফেনায় ভিজেগোলাপেরা
ঝরে যায় ক্রমাগত।···

কেবলই আমরা দু'জন এখন
অপেক্ষা করছি সমুদ্রের জন্যে
নষ্ট, কালো বিছানায়।

কথা ছবি হ'লে

'এসো, আজ রাত, শুয়ে পড়ি,' ব'লে ফেনা
নিভে গেছে, শুধু ফুল বলে, 'ওকে ডাকো !'
দূরে চাঁদ ডাঙে, কাছে কেউ আসছে না
প্রিয় জলে যেন ডুবে আছে কোনো সাঁকো।

বৃষ্টি আনে তাকে, মাঠ ক্রমে শেষ হয়
প্রথম আলোয় চোখ-মুখ ধুয়ে মাছ
বাইরে এসেছে—নিয়ে গেছে পরিচয়
টানা বালুচরে নেচে ওঠে ঝাউগাছ—

কথা ছবি হলে নতুন আকাশে তার
দেখা যাবে ম্লান, শ্বাসরোধী শবাগার···

ঈশ্বরীর পাঠক্রম

জল

সে ঠিক তাকিয়ে আছে, বাহু তার মূলাগ্র ধরেছে
মোহিত শিকর যেন, শব্দহীন টানা ঘাসবনে
একান্ত রঙীন এই দৃশ্য তুলে ধরে যে আকাশ
আদিম ডিমের মত, শ্বাসরোধী, তার কিছু জল
আমিও সমস্ত রাত ঝরে যেতে দেখেছি কেবল !

ঘোড়া

সমাধিফলকে লেখা বর্ণমালা পাঠ করে নারী
একাকী একটি ঘোড়া অধোমুখে ঘাস ছিঁড়ে খায় ;
অখণ্ড সমুদ্র এক রাত্রির ভিতরে সে দাঁড়িয়ে—
রঙ্গ দ্যাখে অগোচরে ফুল, পাখি, বেশ্যা ও মাতাল।

মাছ

জাল ডুবে গেছে জলে ! কারুকার্য এইভাবে
ফুটে ওঠে, ভেঙে যায় ; অপেক্ষা ক'রে আছি
কীভাবে গুটাবে তুমি তাকে ! কখন আমাকে
বলা হবে, 'এই নাও, আদিম রোমশ রঙ্গালয়'
বস্তুত এখন তার স্বপ্নে কোনো লাবণ্য পাই না।

গোলাপের কথা

তুমি গোলাপের কথাগুলি বিক্রী করো প্রিয়তমা।
তুমি জানো না যে, তুমি কিছুই জানো না, অথচ নির্জনে
রক্তপাত হয়, খেলাচ্ছলে, রাতে—
পুনরায় তুমি গোলাপ বিষয়ে বলো
তোমার আদিম কথা, বিক্রী করো কথা, খেলা চলে

এই প্রথম স্বপ্ন

আমি লিখবো। যাতে কাগজ থেকে
টপ টপ ক'রে জল পড়ে—

এই প্রথম স্বপ্ন, শাদামেঘ চোখে জল এসে যাচ্ছে
আমার কাছে যেন থিতু হয়।

ধুলো ভরতি হ'য়ে আছে
গাছের পাতা খসে উড়ে যাওয়া—

ছোট ছেলেটা কার ভিখিরি ?
শুধুই গন্ধ। আর কিছু না ?

এতোদিন ছিলে আমপাতা।
আজ চুপ ক'রে থাকলে ছাড়বো না।
তোমাকে বলতেই হবে কী হয়েছে, কবিতা ?

সকাল-বিকেল নিঃশব্দ ঠিক এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকে। ওদের
কি পায়ে ব্যথা করে না !
কিন্তু কোথাও কোনো শব্দ নেই। এমন একটা
শব্দ শুনতে পাচ্ছি।

রোদ

ভোরের রোদ হাঁপাতে হাঁপাতে তিরতির করা দেবদারু গাছের ডাল ছুঁইয়ে দিল তার পাখা। আঃ কি দৃশ্য, আঃ কি আরাম! দুলতে দুলতে নেমে এলো তেতলা বাড়ীর চিলেকোঠায়; তারপর কার্নিশ বেয়ে একলাফে আমার চায়ের পেয়ালা পিরিচে; একেবারে আমার সুদিনের মধ্যে ডুবে গেল।

আজ আমার বাথরুমের দরজা বন্ধ। অন্ধকার যদি নাও বলি, বলতে হবে, একটা কালচে সাপের খোলস চার দেয়ালে সাঁটা। বর্তমানের গুনগুনুনি নেই, ভবিষ্যৎ ক্ষমা প্রার্থনা করে গেছে। একটা মাত্র ঘুলঘুলি আশা নিরাশার দ্বন্দ্বে দুলছে। আর সেখান দিয়ে ঢুকে পড়ছে সব স্মৃতি— যা সতত সুখের নয়।

এমন সময়, দরজাটা খুলতেই চিৎকার করে উঠতে হলো—রোদ, রোদ, রোদে পুড়ে গেল আমার চামড়া। অতর্কিতে এসে, সে আমার সকল ব্যর্থতা প্রকাশ করে দিয়ে গেল শুধু।

রূপসী বাংলাকে

এখনও রূপসী তুমি, মোহময় যুবতী শরীর
আজও আমন্ত্রণ আনে সবুজ শাড়ীর ভাঁজে ভাঁজে,
অজস্র চুলের চুমা আজও ঝরে হিজলে কাঁঠালে
কেশবতী কন্যা আজও নেমে আসে কুয়াশার পথে।

এলাম তোমার কাছে পেতে চাই ঘনিষ্ঠ আদর—
তাকাও আমার দিকে, নীল বিষে জ্বলেছে শরীর।
চুম্বনে চুম্বনে দাও শুদ্ধতার স্থির প্রতিশ্রুতি
শীতলতা মুছে ফেলে আবার উত্তাপ পেতে চাই।

চীর চন্দন হার সব কিছু দূরে ছুঁড়ে দিয়ে
আমায় আশ্লেষ দাও তৃপ্ত করো, দীপ্ত করো, প্রেম
ভিক্ষা চাই, দয়া চাই, আরও চাই মৈত্রী ও করুণা।

নাকি এই ব্যবধান, গড়ে তোলা ইচ্ছের আড়াল—
কোনোদিন ঘুচবে না, ঘুচবে না কোনোদিন আর,
শুধু এই কাছে আসা, চেয়ে থাকা, ভালোবাসা অঞ্জলিতে ভরে
বার বার ফিরে যাবো তোমার রূপের স্মৃতি নিয়ে॥

আবর্তন

কাপালিকের নগ্ন রাত্রি ফুঁড়ে বেরিয়ে আসে
আরো একটি রক্তাক্ত ভোর।

আমি তোমার মুখের ওপর ক্রমশ ঝুঁকে পড়ি,
দেখতে চাই, চোখের জল সম্পূর্ণ শুকিয়ে গ্যাছে কি না—
দেখতে চাই, আর কত দিন নিজেকেই বয়ে বেড়াতে হবে
নিজের মৃত্যু সংবাদ।
শুকনো জলের দাগ কাণি হয়ে জড়িয়ে আছে
তোমার চোখের তারায়
রক্তাক্ত ভোর গড়িয়ে যায় বিজ্ঞাপনিক সন্ধ্যার দিকে।

পাগল

সব অপমান আমি টুসকি মেরে উড়িয়ে দিতে চাই
জীবনের বাইরে,
সব অপমান আমিও পাল্টে নিতে চাই
ফুলে, মেঘে, রঙিন ফানুসে—
সবটুকু পারি না আজও,
অন্ধকারে কোথায় কে জানে থেকে যায় জ্বালা
অপমানের শুকনো দাগ।

পাথর, নিরক্ত দিনে নিজস্ব নির্জন থেকে উঠে আসে
হু হু হাওয়া, আর

একলা পাগল আমার বৃষ্টির মধ্যে দিয়ে হেঁটে যায়
রাত্রির দিকে,

বৃষ্টি এসে ধুয়ে দ্যায় অপমান, অশ্রুর ফোঁটা।

সহজিয়া

তাঁর আশীর্বাদ নেই, অভিশাপ
নেই আর আজ। পড়ে যায়, গড়ানো বিষফল—
দুহাত ফাটলে ভরে তুলে তুলে ধরে দিতে যত
যেন ড্যালাকরা ছাই, তেতো নিষ্ফলতা,
চিবুকে দাঁতের দাগ ব'সে আছে, উপবাসী—
ক্ষমা দাও, বিশালাক্ষী, তাঁর
চাহনি পাথর ; মুখ অদহন নষ্ট ধাতু ; তা হলে যে ছুঁতে
না ছুঁতেই মনে হলো ডৌল ভেঙে চ'লে পড়ে যাবে
জীবন মৃত্যুতে · তুমি বিষলক্ষ্মী, অমৃতলক্ষণা ?
নাকি লোকে যা যা বলে তা-ই, সেই
মাটি ও মুখোশ।
ওঠাতে পারি না ঠেলে চূড়ান্তের পর
দুই চোখ। অথচ খচিত
কলস তুলেছে দূরে জলভার ; মেঘের ওপারে
মেঘ জমে অন্ধকারে মন্দির উঠেছে। একরত্ন তারা,
যে আছে ওখানে, জানে কতো
হারানো ঘরের টানে ফিরে যেতে চাওয়া
অপেক্ষায় এত বেলা হয়। আর এই দুচোখ
জ্বালা করে। যেন যন্ত্র, তারার কোণগুলো
ভাঙাচোরা, জলে ধোয়া, বড়ো উজ্জ্বলতা। আরও ভালো জানো
তুমি ভেঙে যাওয়া মানে সহজতান্ত্রিক। একান্ত সরলভাবে
এক তারা জানে। আর ঘাটে এবড়ো খেবড়ো কাঠে
শীতল সমর্থ হাতে আহত নির্মলতর হতে চাওয়া ওই
হাওয়ার ঝাপট···ওরা বেশি ও বিষণ্ণভাবে জানে।

তিনি নড়েচড়ে উঠলে

তিনি নড়েচড়ে উঠলে গলায় আরও গভীর ভাবে
কেটে বসল অভ্যাসের ফাঁস
তিনি প্রৌঢ় হয়েছেন
তাঁর মুখে সময়ের নখের আঁচড়
তাঁর ঠোঁটে ক্লান্তির শুষ্কতা
অনাদিকাল থেকে অভ্যস্ত নিষ্ঠার তিনি
সৃজনকর্ম মারণকর্ম রক্ষাকর্ম ইত্যাদি দুরূহে
কার্যভার বহন করেই আসছেন
এতদিনে হালকা হতে চাইবার কথা তো বটেই
কিন্তু অভ্যাস ছাড়ছে কই

তিন নড়েচড়ে উঠছেন
কিন্তু ভক্তর হাতে
তাঁর ফাঁসের দড়ি

মুক্তি পাওয়া
এত সোজা নয় বুঝে
তিনি পুরনো দাপটের মুখোশ
নতুন ক'রে এঁটে নিলেন
রামজন্মভূমি-বাবরী মসজিদের সমস্যা
আনকোরা রক্তে
সাবেকি পবিত্রতা পেল
ঈশ্বরের আত্মসম্মানটুকু তো বাঁচল

ভ্রম

আমার অনন্ত ভ্রম আমারই ভ্রমণ!

যাই অন্তে, যাই দাহো, যাই মিথ্যে প্রেমে ও পরাগে,
যাই মৃত্যুর নিয়তি-নিয়মে,
পথে কার পবিত্র স্মৃতি পড়ে যায়!

ডাহুকে ডেকেছে, তাই সবুজে দাঁড়াবো একাকী
এ নাম আমার গ্রাম,
এই পা পাথরে পাথর একাকী।
মানুষের পথ ধরে মধ্যাহ্ন বিছায় ভ্রমে ও ভ্রমণে!

কার হাতে আমি তুলি দুঃখ, অভিমান?
কার বুকে বালকের আশ্রয় এখনও?
কার চোখে চোরাবালি, চাতুর্য, চারণ?
কার পায়ে পার হই অমর্ত্য ভ্রমণ?

চুম্বন যেমন ভ্রমে প্রেমহীন, রাত্রিব্যবহারে
সহবাস যেমন অভ্যাস,
আমার অনন্ত ভুল তেমনই তো ভূলোক-জীবন।
নষ্টে যাই, কষ্টে যাই, প্রতিদিন
ভস্মে যাই, অন্ধকার প্রমাদে পাগল!

মানুষের মুখ ধরে ভাষা শিখে নিতে
বৃথা মর্ত্য, বৃথা সত্য, বৃথা এই
জীবন ফেরাই!

বরান্তহা

পাতাল পর্যন্ত হাঁ মুখ, যেন সর্বস্ব খেয়ে নেবে।
অন্ধকার পোড়া ক্ষীর দু'হাতে সরিয়ে
সম্মোহিত ঢুকে যাই দানবের পেটে।
করাতকলের শব্দ শোনা যায় ;
করাত ? নাকি পাথর কাটছে কোনো খরশান নদী !
সুড়ঙ্গের ওপাশেই পরীদের দেশ,
সেখানে মুহূর্তের জাদু থেকে
মানুষ পুতুল হয়, পুতুল মানুষ।

আগুনবিদ্যা শিখে উঠে আসছে কারা,
হাতের মুঠোয় ধরা হলুদ মশাল !
তাদের কথার শব্দ গুম গুম স্বরে
পাক খাচ্ছে গুহার ভেতর।
বাসুকি সাপের মতো ভীম স্তম্ভগুলো
বিপুল পাথর ছাদ ধরেছে মাথায়।

এই অনন্ত গুহাপথে কোথায় চলেছি ?
পৃথিবীর অন্ধকার পিঠে ?
যেখানে আগুন ঘিরে নাচ শুরু হলো ?
পশুমাংসে জমে উঠলো আদিম বারবেকিউ ?

ঘাস-ব্যারাক

আজকে এমন ভূত জোছনায়
আজকে এমন নিশির ডাকে
আমার কিছু করা উচিত
আমার মনে পড়া উচিত
আলোছায়া ডাকছে কাকে

আকাশে নীল বিষের ছায়ায়
আকাশে নীল কুম্ভীপাকে
আমি যেন গিলি না ছাই
আমি যেন ঘুমিয়ে না যাই
আলোছায়া চায় আমাকে

আমাতে এক প্লীহার ব্যথা
আমাতে এক দম্ভ থাকে
আমি যেন পালিয়ে আছি
আমি যেন সার জেনেছি
আলোছায়া ভূত ক'টাকে

আসলে চাই ভড়ং দেখি
আসলে চাই সেই নিজেকে
আপন খোঁজেই এমন ভাবি
আপন খুঁজে খুনখারাবি
আলোছায়া খোঁজার ফাঁকে

আহা এই তরাস রাতে
আহা এই ঘাস-ব্যারাকে
আমাকে আজ জড়ায় গাঢ়
আমাকে আজ হারায় আরও
আলোছায়া পথের বাঁকে !

চন্দ্রাতপ

ওহে, তোমরা রাস্তায় পাথর ফেলেছো কেন ?
আমি চিৎকার করে উঠলাম :
পাথর সরিয়ে দাও, সরিয়ে দাও মরচে পড়া পেরেক
আমি হেঁটে যাবো এখন

ওহে, কে জেলে দিয়েছো সূর্যের চকমকি ?
আমি চিৎকার করে উঠলাম :
আমাকে একটুকরো মেঘ দাও, বিছিয়ে দাও ছায়ার মখমল
আমি দুর্গতোরণের কাছে পৌঁছুতে চাই

কিন্তু আমার চিৎকার দূরের পাহাড়ে ধাক্কা খেয়ে
ফিরে এলো আমার কাছেই
যেমন ফিরে আসে উপরের দিকে ছুঁড়ে ফেলা থু থু ;
পাথর আরও কর্কশ হলো খুলির দাঁতের মতো হেসে উঠলো মরচেপড়া পেরেক
সূর্যের অঙ্গার সরিয়ে কেউ এসে দাঁড়ালো না পাশে
যার হাতে মেঘের ছাতা
একতারার তারের মতো যখন একাকী দাঁড়িয়ে আছি
বাষ্পাকুল হয়ে উঠছে অভিমান
যখন একপা-ও এগোনো হয়নি আমার—

তখন বিরাট আক্রোশে ছুঁড়ে মারতে চাইলাম পাথর
বিঁধিয়ে দিতে চাইলাম পেরেকের প্রতিশোধ
এভাবে একটি একটি তুলে নেওয়ার ফাঁকে
দেখলাম, আমি এগোতে পারছি একটু একটু
আমি···খানিকটা দূরে আর একজন···আরও একজন···
এইভাবে অসংখ্য পর্যুদস্ত মানুষের
সমান্তরাল মিছিল···
আমরা পরস্পরের দিকে তাকিয়ে
হাসলাম নিঃশব্দে :
যে হাসি থেকে ঝরে পড়লো বৃষ্টির মতো ঘাম
যে হাসি চন্দ্রাতপ হয়ে গেলো আমাদের প্রত্যেকের মাথায়···

চা-বাগান

১.

তোমাকে গোপনে পেলাম, নিরালা বাংলোর উঠোনে সাজানো ঘরে
সোফায় টেবিলে ফ্লাওয়ার-ভাসে রইলে ছড়িয়ে—এতো তুমি
কী করি এ বিপুলতা, অনাদেশীয় ফুল পাতা
চুড়ির শব্দ অন্ধকার করিডোরে···
আমার পায়ের নিচে এখনও কি খরস্রোত, পাথর !
'মালখোলা' নদীটি দু মাইল পেছনে রয়েছে পড়ে
জল থেকে ভেজা পায়ে উঠেছি কখন
তবু যেন কেঁপে গেলো পা
বারান্দায় কেউ কি উঁকি দিলো, ভৌতিক চাঁদ, অভিলাষ, ভয় ?
তোমার মেঘছায়া শাড়ি উড়ে গেলো জ্যোৎস্নায়
কোথায় হারালে তুমি ? কোথায় হারালে ?

২.

গোড়ালি ডুবিয়ে জলে বহুক্ষণ ছোটাছুটি হলো
পাথরে বালিতে স্রোতে
তোমার রঙিন ওড়নাটি ভেসে গেলো, আমার একপাটি জুতোও
ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসে রইলে তোমরা
পাথরে বালিতে
গড়ালো আপেল, থার্মোফ্লাস্ক, তোমার কুকুর ;
আমার চশমাটা লুকোলে কোথায় ?
তবুও শুনিনি বারণ
খালি পায়ে নদী পার হয়ে বহুদূরে এসে গেছি
জলের উজানে
আমাকে টেনেছে পাহাড়ের মগ্নতা, অবিরাম পাতার কাঁপন বুকে
অথচ যতোই যাই, পাহাড় ও কি পিছু হটে

কতোদূরে সরে গেছে তোমাদের চা-বাগান, জীপ গাড়ি
দুপুরের আয়োজন
জটিল জঙ্গলে ডুবে গেছে পথ
পাথরে ছড়েছে পা
নিঝুম নিসর্গভূমিতে একা পড়ে আছে রক্তক্ষরণের দাগ

৩.

শালবনে বহুক্ষণ ঝরে গেছে জল
পাথরে ও নীলিমার বিজন গভীরে
এখানে কি প্রেম ছিলো ? মুক্তি ছিলো ?
পবিত্র গোপনতা ?
এমন মৌনে কেন নিজেকে ছড়াতে এলে, ছায়াপল্লবে

সভ্যতা কতোদূর
অতীত ভবিষ্য ভেঙে ঐদিকে উড়ে যায় হাওয়া
শঙ্খিনী ঝোরা পার হয়ে গেলো একা মন্থর মালগাড়ি
যেন সে কোথাও প্রতিশ্রুত রয়ে গেছে
তোমারও কি অঙ্গীকার ছিলো ! অবরোধ ?
কোন্‌খানে ?
এইসব ভেবে আজ স্মৃতিপ্রায় বেড়ে ওঠে পাতার আড়ালে
হৃদয়বিন্যাস, ব্যক্তিগত অশ্রু ও উত্থান

৪.

জানলার ঠিক নিচে লেবুগাছ
সারারাত গন্ধ দিলো মায়াবী আঁচলের

দূরে মাদলের শব্দ থেমে গেলো
তখনও শোওনি তুমি
বহুদিন পর এসেছিলো আবাল্য সখী
রাত জেগে প্রিয় বয়সের উত্তাপে সেঁকেছিলে হাত

বক্ষবন্ধনী পড়ে ছিলো অমনস্ক উঠোনের ঘাসে
জ্যোৎস্নায় বেজেছিলো হাসির শব্দ
অথবা ঘুঙুর
শুনেছিলে
এ ঘরে তখন নির্ঘুম হাওয়া
রাত্রি লীন বাঁশিটিতে দিয়েছিলো ফুঁ ?

৫.

পিপুল গাছের নিচে লুটিয়ে পড়েছে চাঁদ
হাড়িয়ার গন্ধে মাতাল
নাগরার গভীর শব্দ তুলছে ঢেউ ওঁরাও যুবতীর দেহে
ছেঁড়াখোড়া পাপড়ির মতো রয়েছে বালিকাও
একই শব্দে, নৃত্যদোলায় বেড়ে ওঠে তারা, গর্ভিনী হয়
এতোটুকু ফাঁক নেই
এইসব উচ্চকিত বয়সে, উৎসবে অথবা আত্মায়,
দিনরাত্রির ঘাম আছে. অগণিত সন্ততি আর কখনো সখনো
লরি ভর্তি চলে যাওয়া সাধনা-টকীজ

টায়ারে জ্বলছে আগুন, গন্ধ ও ধোঁয়া নিয়ে
হিমেল রাত্রির বুকে এইসব উত্তাপ
কোমরে জড়ানো বাহু, এক সাথে দুলে উঠছে পা
নাভির ভেতর করতালি, পূজা ও প্রণতি
উঠোনে ময়ূরের ঝাঁক
নাগরার গভীর শব্দে উঠে আসছে পার্বত্য পৃথিবীর ভোর

৬.

পাহাড়ের পেছনে পাহাড় আরো—সজল মেঘের
হেমন্ত দুপুরেও মাঝে মাঝে ভেঙে পড়ে তারা
ঝরে যায় এইখানে মানুষের সমবেদনায়
উপরে একান্ত নীল, সারাদিন রোদের ভেতর
স্বচ্ছ, অমলিন, বিশ্বাসে ক্রমশ ব্যাপ্ত এক নীলের প্রাকার
নিচে তার বনস্থলী, বুনো হাঁস তিতিরের ঝাঁক
ইতস্তত ছড়ানো কাঠের বাড়ি

স্মৃতির সমগ্র ছেড়ে এসেছিলে এতোদূর
এখন কি হৃদয়ে ক্লান্তি !
হাত থেকে খসে গেছে ব্যক্তিগত চিঠিগুলি—বাত্যাতাড়িত
পেছনে ফেরালে চোখ, নিদাম ঝোরার জলে এক ত্রস্ত হরিণ
নির্জন রেন-ট্রীর তলে পড়ে আছে কুলি কামিনের গান

৭.

তুমি তবে এখানে আসোনি ?
শালের জঙ্গলে গভীর দুপুরে ভেঙে, খরস্রোতা নদী ও সৈন্যাবাস, চা-বাগান
পেছনে ফেলে এতোদূরে চলে আসা
এ তবে সত্য নয় ? এ মর্মবেদনার ছবিগুলি ?
তিস্তার হাওয়া এসে গিলেছে বাসনাটুকু, তবু এতো গুঞ্জন কোথা থেকে আসে
হৃদয় বৈষম্য আমাদের নিয়ে যাবে কতোটা দূরত্বে আর

এ নিসর্গ এমনই অলীক, কুয়াশার তলে ডুবে যেতে যেতে
কীরকম প্রবঞ্চনা দিয়ে গেলো
মেয়েদের ইস্কুলের মাঠে উড়ে গেলো শূন্যতার ধূ-ধূ পাতাগুলি
পাহাড়ের ওপরে রইলো চাঁদ, হস্টেলের ঘরে একা বোটানির দিদিমণি
কেউ কাউকেই দেখলো না, ডাকলো না
ভরন্ত আকাশে কোনো পাপ ছিলো ? অভিশাপ ?
ঠাণ্ডা আগুনে পুড়ে গেলো ভ্রমণের হলুদ পাণ্ডুলিপি

৮.

বাগানের পারে চাঁদ উঠে এলো করুণ শীতল

তানপুরা ছেড়ে তুমি উঠে এলে কেন
রেলিঙের কোণে, এতো চুপ, ছায়াময়
এই তো রাত্রি কাঁপছিলো মধুবন্তীর সুরে
উঠে এলে কেন
শেষ জ্যোৎস্নার চাঁদ বুঝি এরকমই হয়
বিদায়ের কথা ভেবে ভেঙে যায় গান
অসমর্থিত থাকে
নষ্ট হয় ফুল চাঁদ পাথর প্রতিভা
আজ শুধু হোক নীরবতা, শেষ নিশীথের ঘুম

সুতপা সেনগুপ্ত

ব্যথা সংবাদ

১.

যাও যাও রে উড়ি পাখিগণ
ইণ্টরে আমার গিয়া কহিও
তিনি বা সে কিম্বা ইহা যা হইক
ইচ্ছা আর করিব না তাহারে
ইচ্ছা রে পড়িলি বাঁধা ড্যামে
হায় পাখি পাখি হইয়া বুঝিলি যে ভাষা
ইণ্ট কেন বুঝিল না, ধ্যান ব্যাখ্যানে
ড্যাম দিল ড্যাম দিল জলজ শুকাল
আর জলধারা মৃত্যু হইয়া অন্তর্ধনি করে
যাও যাও রে উড়ি পাখিগণ
কহিও ইণ্টরে আমার মৃত্যু হইলে যেন বুঝে
আমার পাকের অম্লব্যঞ্জনের স্বাদ

২.

ঝুমুর গান গেয়েছিলে
পর্বে পর্বে বেঁধেছিলে
যে চাহনি দিয়েছিলে
তাহারে বন্দনা
আমার মেঘে মেঘে চতুষ্পাঠী হোলো তিন বেলা
বেলার প্রতিনিধি হইও জলপানি দিব
ও আমার শরৎশশী তোমায় সাজাইব
ঝুমুর গাইয়াছিলে
আমারে মজাইয়াছিলে
এখন মজা নদীর কুলে কেন বাঁশরীধারী

৩.

স্বামী হে বাগান হইতে ফুল তুলিবে না
এখন গৃহ সাজাইব কোন্ পুষ্প দিয়া
শহর কাঙাল করে আমা হেন জনে
আর গ্রামে কি বাঁচিতে পারি প্রতিবেশী বিনা
যন্ত্রণা বহি রে তুমি যন্ত্রণা বহিলে।
তোমার কান্না দেখে আমার দেহ-একতারা
বাজাইতে বাজাইতে কোন্ গগনে ডাকিবে
আর বৃষ্টি পড়িবে যদি তোমার পরান
পড়িও আমার লিখা, বাগান আমার
পুষ্প বলি যদি স্থান দিলে বক্ষে ভালে

৪.

যদি জলে দেখ নিজ ছায়া
আমারে ফিরাইবে কোন্ মনস্তাপ দিয়া
ফিরাইতে চাও না জানি, শূন্য হইতে পড়ে
মোর কুঞ্জখানি তোমার শূন্যের সলিলে
ভাসিয়া যাইতে থাকে শোলার মুকুট
তখন মায়া হইল বটে সন্তরণে দূর
দুঃখের গাঙিনী, ভগ্ন ঘাটের উপর
আমাতে জলেতে মাখি দেখ পরচ্ছায়

৫.

ব্যথা কেন পেলে বন্ধু, ব্যথা কি দিলে না
জলে ভাসমান কাষ্ঠ ইন্ধনের নয় ?
যদি অভিমানিনী হইয়া আলে বসে থাকি
দিনমান শেষে ক্ষুধাকাতর কুলায়
দূরু দূরু জ্বলে যদি দুজনার মুখপানে চেয়ে
তোমার ব্যথার ক্ষতে পাতা বেটে দিব না কি আমি

দীপক হালদার

শরীর

তারপর এ শরীর হে শরীর হাই কি খবর তাইরে নাই করে
বহুৎ দিন তো কাটলো ভাই এসো একসাথে শোয়া বসা করি
ঝিঙে উচ্ছের বাগান করি পুঁই মাচান থেকে ডিমুলি নিয়ে
রঙ করি সমস্ত সকাল আর না দেখা মাটিকে উসকে দিই
একটু একটু করে চিনতে জানতে থাকি তার বর্ণমালা
অন্তাক্ষরী গান থেকে তুলে নিই বিল্বপত্র পুষ্প আদি
সময় সুষমা আর ভুলে যেতে থাকি জীবন ও যাবতীয় খেলা

শ্যামলবরণ সাহা

অঙ্গুরীয় আখ্যান

যেদিন প্রথম তোমার শীর্ণ অঙ্গুলি লতাতন্তুর ন্যায়
আমার অনামিকা জড়াইয়া ধরিল, মনে হইল—আংটি পরিয়াছি।
আজ হাতের আংটি খুলিয়া লও! সর্বাঙ্গে বিষব্যথা ফেনাইয়া উঠিতেছে...
পাথরে অগ্নি নয়, জল দর্শন করিতেছি। হায়, কাহার অশ্রু
পাথর হইল আংটির ফুলে ?

হাতের নিকট হাত দীর্ঘজীবী হউক। আংটি তুমি খুলিয়া লও!

পোকা

হত্যা খুনে শেষ হওয়া পথ সাতসাগর পেরিয়ে এলো শেষে।
পেরিয়ে এলো নুড়ি পাথর বালি ধুলোর কাদা,
পেরিয়ে এলো পোকার মতো
একটি গলি ; ক্ষীণ আলোর রেখা।
পোকায় কাটা এক মানুষ সেখানে জাগে একা।
বই এর পাতা বাঁকা হাসির মতো উড়ছে।
বাক্যে ক্রিয়াপদ বা চাঁদ নেই,
নেই রোদের মতন বিশেষণ।
অন্ধকারে অন্ধ লাঠি খোঁজে।
পোকায় কাটা কথা-বার্তা লাঠির মতো বাজে।

কোথায় লাঠি, কণ্ঠস্বরও কই ?
গন্ধ আসে : কোথাও যেন পাড় ভাঙছে জল।
সে জল নামে পাথর বালি ঠেলে ঠেলে
পাতালদেশে, মানুষগুলো কি এক নেশায় লাল।
পোকায় কাটা জন্ম আর মৃত্যু চাদর ঢাকা।

বিশ্বরূপ

শ্রীকৃষ্ণের ছবি দেখলে মনে পড়ে বাবাকে আমার
কৃষ্ণকলি রূপ নিয়ে উঠে আসতো কৃষ্ণলীলার
ধূপ-ধুনো গুলগুল মাথা
ঝলমল পোশাক আর হাতে ঘোরা চক্র না কী চাকা।
আর কিছু মনে নেই, শুধু সেই দশকাঠা জমিটার ধান
আটকাতে গিয়ে ছেঁড়া চেনটি ঘোরানো আর চিৎকার : লাঠি আন, আন

তারপর তাঁর বেঁধে পায়ে, চাকা ঘুরে পড়ে যায়।
শীত রোদ এবং হাওয়ায়
শ্রীকৃষ্ণের মতো কালো ভেজা মাটি, সবুজ আলপথ
এক একটি উন্নাসিক গৎ
বৃন্দাবন থেকে শুরু, মথুরা ও কুরুক্ষেত্র, সবশেষে যদুবংশে ছেদ
আমার বাবার সেই হাহাকার ; রক্তময় জিদ—
রক্তশ্মশান জ্বলে।
প্রতিধ্বনির মতো ফিরে আসে দশকাঠা জমি আর জলে
বাবা ও কৃষ্ণের মুখ ; কেবল ঘোরানো সেই চেন না কী চাকা।
অমিল ঘর্ঘর ধ্বনি মাথার ভিতরে : এ কি বিশ্বরূপ দ্যাখা ?

ভূত

আমরা ভূত। আমরা নির্জনের। আদি ছিল শূন্য।
সেইখানে প্রথম ফুটে উঠলো জবা। ক্রমে
জবা পেয়ে আমরা লাল। গরীব। কিন্তু মাতৃভক্ত।
খাঁচার ভিতর চন্দ্রসূর্য। বাসী নদী। রোগা গ্রাম।
মহাসুন্দর ডিম গড়ায়। অজস্র পথের শিশু।
জননী।
জলপেট আবার উঁচু? ভোর হবে। শিশু হবে।
আমরা যারা আগে এসেছি, একদিন পুরানো হ'য়ে যাবো।
দুধের নিসর্গ। মাছের আঁশ উড়বে। জেগে
ঘুমোবো আমরা। ঘিলুর রক্ত আর খাবো না।
আকাশপক্ষীর নিচে থাকবে রান্নাঘর। আমরা
বলবো। রঙ, তুলি আর প্রসবের কথা

ভক্ত

আঁধারঘর। গন্ধঘর। আর ঐ দিগন্তের মায়ের কথা
উপুরে করা ভাতের থালা। পরিবারের প্রথম ইঁদুর।
বৃষ্টির নামতা। হংসঝোপ। আছে মর্ত্য।
মাকড়সা জাল দিলো। সাপ ছোবল দিলো।
মোরগ তার চূড়া দিলো। খাঁটি এই আনন্দ।
আমরা তো ঘুমের বাড়ি। টেবিলের ওপর থেকে
গড়িয়ে আসি বিছানার দিকে। শুনতে পাই
মৃত অক্ষরদের উলু। আমপাতার পথে পথে কান্না।
বুকের পাঁজর দিয়ে তৈরী করি পুকুর। জলের নিচে
বয়ে যায় হাসির পাঠশালা। নৌকার খোলে
রাখি চিঠি। সেই চিঠি বলদেরা পড়ে। আর
থালাভর্তি ছাই নিয়ে মায়ের ভক্ত সব। জটায় গঙ্গা

মৃত্যুর পর

মৃত্যুর পর তাকে নিয়ে আর লেখার নেই কিছু। ব্যাপার তো শুধু সেই সুভাষগ্রামের সরু রাস্তা, সেই মেঘ নির্জনতা, সেইসব চমকে-ওঠা।

তার মৃত্যুর পরের দিন দেখলাম কলেজ স্ট্রীট প্রতিদিনের মতোই মুখর। এক কবিতা-লেখক অন্য এক কবিতা-লেখকের প্রশংসা করছে মাথা নেড়ে নেড়ে; এক গল্পকার অন্য এক গল্পকারের রক্ত চাইছে; একজন প্রকাশক বলছে 'রচনাসমগ্র থেকে লাভ বেশি, কবিতা ও ছোটগল্প থেকে লাভ কম'; এক ভিক্ষুক-মাতাল এক সচ্ছল মাতালকে ফিস্‌ফিস্ করে রাস্তায় বেরিয়ে পড়তে বলছে; একজন পণ্ডিত বলছেন 'মার্কসবাদ ভালো, লেনিনের প্রয়োগেই ভুল ছিলো।'

যেন কিছুই হয় নি, এই ভাব আমিও দেখাই। এগিয়ে-আসা অস্থির মেয়েটিকে কী বলবো বুঝতে পারি না। কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে বলি 'একটা মানুষের জীবনই হচ্ছে মানুষের মূল কথা।'

প্রশ্নমালা-১

মৃত্যু কি পাপ ? সেতো তবু ছাদে একা কাঁদে একা
প্রথম বৃষ্টি নেয়, কন্দ নাভির পাড় ছোঁয়া জিভ, কেডস্ জুতো
টিফিনের বাতাসিয়া গান

সবাই আনত যায় দোলে শীর্ষে জ্যোৎস্না ও পাতার আঙুল,
আজ জ্যোৎস্না আজ দেবতার টিপ
স্থির জড় এতল্লাট শাদা মরুভূমি

এখন তোমার কোনো কাজ নেই, এখন তো তুমি কিছু ভাবছো না
ভাবতে পারছো না
বাইরে যেমনই হোক ভেতরে দুজন আমরা
একরাশ চুল ছুঁয়ে বসি,

'গতজন্মে তুমি মৃত্যুর দেবী ছিলে'—
তাকে বলি।

শৃঙ্গার আষ্টক

১.

স্বর্গদ্বারে বসে আছি, আয় স্বর্গ যতদিন না মরি ততদিন
এই লালা গিলতে হবে
গায়ে কী জ্বর অসম্ভব—তোর নামে কুকুর পুষলাম
নাড়ো দেখি লাঙ্গুল, আর আঙুল ঢোকাই তোর গুহ্যে
যতদিন বাঁচি—আঃ বাঁচিলাম

২.

প্রসিদ্ধ ক্ষত বাড়ালে আমি কি আর সান্ত্বনা পাই ?
প্রেম শব্দ কামময়, হতে পারি অমরোগী
তা বলে একমাত্র লেংটি আমার সম্বল তা কী করে হয়
তাছাড়া বুকভর্তি লোম
মাছ উলকি আঁকা হাত—
এতো সহজে মরি না ভাই ময়ূর-ঘরণী

৩.

যখন তোমাকে বলি সহজ সুন্দরী, তখন
শবর-শবরীর কথা মনে পড়ে, উঁচা উঁচা পাবত
তারপর কাঁটামাছ, তার লক্ষ রকম বায়না
তারপর বামতত্ত্ব ডানতত্ত্ব
তারপর হাজার-এক রজনীর পরের ভয়ংকর দিনটি

৪.

আমাকে রোমান্টিক আখ্যা দিলে তোমাকে
ঢ্যামনা বললেও বেশি সম্মান করা হয়
আমার আঙুল টের পাও
গুহামধ্যে বসে আছে বংশীবদন
তার পরিচর্যা করো
দ্যাখো স্বপ্ন পাও কি না পাও

৫.

এখন তরণীতে কে আসো চলে যাও আমাকে মানছো না, সবেধন
নীল না লালমণি, আমাকে কান্দাও, যেওনা রজনীতে যেও না
তখন খরজিভ এখন শৃঙ্গার আমাকে কোন নায়ে রাখবে
তবে যে বলেছিলে কৃষ্ণসখা হোক কৃষ্ণ প্রাণধন, অঙ্গার

৬.

বঙ্গজাত তুমি বঙ্গজাত বলে আমাদের ঘরে এসেছ
আমি তো পালিয়ে যাইনি
আমি তো চেয়েছি এই গৃহখানি
কখনো তোমাকে চাইনি

৭.

তবু এখনো ন্যাংটা হয়ে বসে আছি স্বর্গদ্বারে সহজসুন্দরী
আঙুল তোর গুহ্যে, তুই দেখিস
আমার আঙুল যেন নড়ে না
তোর মাথায় পোকা হোক
তোর পেটে খোকা হোক
কিন্তু দেখিস আমার বীর্য কখনো যেন তোর তালুতে পড়ে না

৮.

যায় যাক সব, আমি শুধু অনুভব নিয়ে থাকতে চাই
জ্বরকে আমি খুব গ্রাহ্য করি কেননা জ্বর একটি একক
তাকে দ্বিগুণ করলে অসুখ হয়
তিনগুণ করলে ছেলেমেয়ের বাপ হয়
একশো দিয়ে গুণ করলে তৎক্ষণাৎ
আমার ষোলজোড়া দাঁত ছরকুটে পড়ে হ্যা হ্যা করে
তখন আমি জ্বরকে একটুও গ্রাহ্য করি না।

মায়া বন্দর

১.

একটি বিন্দু পেয়ে কেউ হয়ে যান বৃত্ত উপাসক।
ওই বিন্দুর কেন্দ্রে রেখে সমবাহু তাঁদের কম্পাস
ঘূর্ণনেই হয় আরও নতুন বৃত্তের প্রকাশক,
কেউ কেউ ভেঙ্গে যান অবশেষে নিজের অভ্যাস।

তখন সরল কিছু রেখা আর ঘনকের তল,
আরও গভীরতা বহুস্তলকের মাত্রা নিয়ে ধীর
স্থির উদ্বোধনে নির্নিমেষ থাকে অচঞ্চল :
সব কোণ নিজের সত্তার কাছে নিজস্ব, নিবিড়।

অথচ বিক্ষুব্ধ সব রেখাগুলো ঝঞ্ঝা নিয়ে আসে,
এবং সংকটে এসে এরা সব শীর্ষবিন্দু চায়,
সাধারণ বাহু পেলে সন্নিহিত কোণের আশ্বাসে
কেউ কেউ থেমে যান, বৃত্তসম ওমেগা বাঁচায়।
অতিভুজবর্গ হয়ে ওটা তাই বড়োই বিরল,
কেননা উহার কাঁধে লয় দুই বাহুবর্গফল।

২.

নিয়তি মন্থর, তাই রাত্রির মিনতিটুকু রাখা।
বিদ্যা বরদাত্রী হলে আকাট শব্দের ভাঙে ঘুম ;
স্বপ্নের ভেতরে যায় জলরাশি, অথচ নিঃঝুম !
প্রাণপণে পরস্পর এ ওকে জড়িয়ে বেঁচে থাকা।

শরীরে গোপন যত অনিবার্য রোমাবৃত হয়,
নিয়তিও ততটাই ; পুরুষত্বে প্রচ্ছন্ন স্বদেশ ;
অবিদ্যা বিভ্রম আনে, প্রজাতন্ত্রে সিংহ আর মেষ,
মীন ও কুম্ভের মাঝে তুলা কিছু জ্যোতির্ময় বয়।

তবুও তরঙ্গ, তবু আন্দোলন, তবু অগ্নি হাতে ফেরা।
যে আগুন বিরহের, সেকি তুচ্ছ শব্দের ভেতর
প্রবেশে সম্মত হবে ? রাজি হবে নদনদী ঘেরা
এ-দেহ প্রকৃতি ছেড়ে পাকে পাকে রমনাইতর
কোনো শব্দে ঢুকে নৃত্য করে যেতে ? রাত্রি, কথা কও !
পতঙ্গ প্রাণের আলো, কবিতার উৎসে তুমি রও।

৩.

মোহে জব্দ না করিলি গোরা তুহুঁ রসিক নাগর !
প্রাণ, তু রহিলি সুখে রসসিক্ত বিভ্রান্তকসম ;
আছিল সমুদ্রমন তরঙ্গের নিমিত্ত, পামর,
মজ্জমান হলি না রে, উদ্ধারিত কালান্তক যমও।

এই যা নিরখি শূন্যো, বাষ্পাকুল এ আঁখি মরুক ;
রূপের সহস্র কাঁটা অহংকৃত শারীরকর্দম,
কার অভিসারে বল বিস্তারিবে ? লো বজ্রহেরুক,
অন্তরঙ্গ রহিল মার্গে, পান্থ মরে, রাস্তা গমগম !

মাল্যবান মেঘদল যার গৃহে কৃষ্ণরূপ পায়,
যে ভামিনী রাধাভাবে শূন্যের দালান কোথা জানে ;
তার শূন্য রমণের অপাবৃত কবোষ্ণ ডানায়
ওই মেঘ নিবিড় আশ্রয়ের যদি সম্ভাবনা আনে
সেকি তবে ইন্দ্রিয়ের অতিরিক্ত দিব্য ঘুমঘোর !
তখনই জোকার ওঠে নৌকাখণ্ডে, বদর ! বদর !

৪.

সমুদ্র টেবিলে এসে এত চিত্রার্পিত যে তার কথামঞ্জরী
আত্মারামে লোহ হয়ে বেঁধে—জলে না ডুবলে পা, উন্নতি হবে না !
দ্রাবিড় ভিঙিতে যারা চলে যায় জীবিকা সম্বল করি
তাদের কেওটমুদ্রা আসমুদ্রহিমাচল সকলের চেনা।

যদিও সমুদ্রে কিছু স্টীমারের আর্য-অভিমান আছে ঠিক,
আছে কিছু বিদেশি ট্রলার, কিন্তু শুদ্র এই মালোদের জাল
এখনো সমুদ্রে গিয়ে ভেসে থাকে, দেবতার কৃপায় নির্ভীক
এইসব জেলেদের আপেল-কামনা নেই, আছে মহাকাল

নাহলে কীভাবে এরা আর্যেতর জীবনের প্রতীকী মানুষ।
কীভাবে কীভাবে এরা ধরে রাখে ইহ মায়াবন্দরের গান !
আমার ভারতমুদ্রা এইসব নাবিকের হাড়ের সাম্পান,
তোমার ভারতমুদ্রা এইসব নাবিকের জীর্ণ ফুসফুস।
এখন মসৃণভাবে যদি সরে যাও ধাতু সহরের দিকে,
তবুও সমুদ্র এসে হাঁক দেবে নব অনার্যের ধর্মটিকে।

সুকুমার চৌধুরী

শোকদৃশ্য

শব্দ কোরো না তুমি। পারো যদি
বন্ধ করো চোখ। ঈশ্বরকে বলো
ক্ষণিক নিভিয়ে দিতে পৃথিবীর আলো।
এ বড়ো হৃদয়দ্রাবী শোকদৃশ্য
অলৌকিক, পবিত্র, সুন্দর।
এক রাত শূন্যতায়
একজন বয়স্ক মানুষ
কাঁদছেন নীরবে
একাকী।

শীত

সকাল

তোমার সোনালী বোতাম লম্বা হতে হতে
ধাতব ছুরি হয়ে ছড়িয়ে পড়ছে এই শহরের বাতাসে।
পাখীর বরফ ডানা ভেঙে নেমে আসছে ঝিলিক ও
পালক-জাল। শিশুর মুখ চিমনি হয়ে
উঠে যাচ্ছে উঁচুতে, ভরিয়ে দিচ্ছে আকাশ
শ্বেতপাথরের ধোঁয়ায়।
হাতের দশ আঙুল থেকে ছুঁচ বেরিয়ে এসে
এলোমেলো করে দিচ্ছে প্রাতরাশের টেবল্। সেই ছুঁচের
দীর্ঘছায়া ছোট হয়ে আসছে ক্রমশ আর ঢুকে পড়ছে
বিভিন্ন কুটীরে। এরপর সন্ধ্যে হওয়ার আগেই
নিঃশেষ হয়ে ক্ষয়ে যাবে ছুঁচগহর। এখন
আগুনছুরির লম্বা মসৃণ ফলা ঢুকে যাচ্ছে নিজেরই
হাতলের ভিতর।

রাত্রি

একটু পরেই শিশুটি খুলে রাখবে তার
কাচের দুটো চোখ, হাত নেড়ে জানাবে শুভরাত্রি।
গাড়ীর তীক্ষ্ণ কান্না আর ঝকমকে দৃষ্টিশক্তি,—
ফুঁড়ে চলে যাচ্ছে শহরের মেধা ও
রাসায়নিক পানপাত্র। মানুষের শরীরে পেঁচানো
মুখোশের হৃদয় থেকে ভেসে আসছে গানের
অন্ধকার আকাশ। আর
মানুষের আগুনে বরফ বিছানা গলে গলে পড়ছে
আঁধার ও আকাশ-রাস্তায়। ফুটে উঠুক সব নক্ষত্র হয়ে।
শুভরাত্রি।

ভয়

তার গল্প থেকে লাফিয়ে পড়েছিল 'ভয়ংকর'
পলকের চোখে মুখে ছড়িয়ে পড়েছিল আতঙ্ক

আমার খুব ইচ্ছে হয়েছিল
তার গল্পকে এক ধমক দিই
বালকের পাশে বসে বলি ভয় নেই

কিন্তু, আমার বড় তাড়া ছিল
আমার ছিল উঠোন ঘেরা গণ্ডী
আগলে রাখা কিছু সম্পর্ক আর
ঘুপচি একটা ভিতর ছিল আমার

আমি বাইরের বালকের পাশে বসতে পারিনি
শুধু মনে মনে তাকে আশ্রয় দিতে চেয়ে
অভয় দিতে চেয়ে
ঘুপচির মানুষজনের টান বেড়েছে

'তারা দুধে ভাতে থাক' এই কামনায়
দুঃখ বেড়েছে, বেড়েছে ভয়
তার গল্পকে আমার ধমকানো হয়নি।

সমীরণ মজুমদার

একটি গোলাপ

শহরের সমস্ত দরজা বন্ধ হয়ে গেছে
যে শহরে আমার এতোদিনের বাস
সেখানে আজ আর কোন আশ্রয় নেই
শৈশব বাগানে আজও উঁকি দেয় স্মৃতি
দু'চোখের কল্পনায় ভিজে যায় স্বপ্ন
ফেলে আসা সুদিন আর ভালোবাসার গোলাপ
আমাকে প্রলুব্ধ করে রাতের মায়াবী ট্রেন
সারাক্ষণ পথে পথে হাঁটি
ট্রেনগুলি চলে যায় কোন অজানা স্টেশনে
নমস্কার, শহরের যুবক যুবতী
আমার স্বপ্ন সবুজ এই এক টুকরো জমি
তোমাদের জন্য রেখে যাচ্ছি—
গোলাপ বাগানে মাত্র একটি গোলাপ

রফিক উল ইসলাম

মহাসংকীর্তন

সরোবরে নীল ফুল, তার কাঞ্চনকেশরে
ঝরে মায়া—
আমি তোমার অঙ্গে ওষ্ঠ ছোঁয়াবো
নিজের বুকেই গাঁইতি কোপাবো
একটা দুটো শব্দ পেতে
মহাকীর্তনের।

নাচের পায়ে ঘুঙুর বাজে
শেকল বেঁধে রাখবে ক'দিন ?
যদি চাও প্লাবনমুখী আত্মাটাকে ছিঁড়ে খাবো।
শুধু তোমার অঙ্গে ছোঁয়াবো এ অঙ্গ আমার
মহাসঙ্গমে,
লীলায় মাথা ও মৌনপদ্মে একটি ফোঁটা
ঝরাবো শিশির।

গ্রহণ করো ইন্দ্রিয়কোপ, অযুত ক্ষুধা
এ জাগরণ দীর্ঘজীবী, এই-ই সম্বল !
এ শরীর মাটি দিব্যচরণ লোভী চন্দনবন
তোমারই পুণ্যে অনন্তজাতক, যতক্ষণ কণ্ঠে আছে
মহাসংকীর্তন !

আক্রান্ত

সিঁড়ি দিয়ে উঠে নিজস্ব নিভৃতে চলে যাও। পরিত্যক্ত
বাড়ী, ভয় করে না তোমার, রাতে সরীসৃপ ডাকে। সিঁড়ি
অন্ধকারে ঢাকে, রোদ পড়ে। ঢেউ ওঠে,
গূঢ় শব্দ নেই—প্রতিশব্দ নেই। জান্তব শীৎকার নেই।

ছাদে একা শুয়ে থাকো। ঘূরন্ত চিলের
ছায়া ছুঁয়ে যায়। এত সাহস কোথায়
পাও। চিলের নখ বিক্ষত করে তুলুক
তুমি চাও। পেঁচা চোখ ঠোকরায়। অমলিন থেকে যায়।
সিঁড়ি দিয়ে উঠে আকাশে মাথা ঠেকাও।
তোমার ভেতর দিয়ে বিদ্যুৎ মাটি ছোঁয়।

হাঁ

জানা ছিল না গ্রহণ এমন নির্মম হতে পারে।
গোটা পা থ্যাবড়া হাত সাদা কালো চুল
আর বিমর্ষ রেটিনা অনায়াসে ডুবে যায়
সমস্ত রাত শিশির ঝরে পাতা থেকে।
আমি স্তন থেকে মুখ সরিয়ে দেওয়ালে টাঙানো মুখোস দেখে
ফেলি—যা ক্রমশ বড় হাঁ'র রূপ নেয়
আর আমি ভয়ে কেঁপে উঠি।
দাঁতের তীক্ষ্ণতা লাল জিভের করুণ নাড়াচাড়া
বড় ভয় করে।
মাংস মজ্জা হাড় শুধু রক্ত হয়ে যায়।

নিজেকে

খানখান করে সে ভেঙে ফেলতে জানে।
তাই অন্ধকারের পাহাড় সামনে দাঁড়ালেও
বলে—'হেঁইয়ো—'
আলোর পিরামিড সামনে দাঁড়ালেও বলে
'হেঁইয়ো—'
আসলে রোদের সঙ্গে তার বড় মাখামাখি।
মর্মন্তুদ বৃষ্টির কাছে একা দাঁড়ানোই তার স্বভাব।
আচ্ছন্ন আকর্ষণে নয়, সর্ষবৎ ফিরে পাবার জন্যে।
তখন সমস্ত কণ্টগুলো তার কাছে আসে
মুখোমুখি দাঁড়ায়
আর
সংঘর্ষময় স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে
সে বিদ্যুৎ চাবকে
গাছের শিখর থেকে
ফুল সরিয়ে আনে...
একটি মুহূর্তের জন্যে।

বাপ্পাদিত্য বন্দ্যোপাধ্যায়

বৃষ্টিপাতের শব্দ

মফস্বলী সন্ধ্যা ঘরে এলে
আলো নিবিয়ে শুয়ে পড়ি—
দেখো দাড়ি কাটার মতো
জটিল কাজগুলো সেরে ফিরে
এসেছি আমি ;
জমে থাকা দুঃখগুলোকে
গলায় বেধে ডুব দেওয়া
উচিত ছিল হয়তো।
মেয়েটির হাসির সাথে
কি করে জড়িয়ে গেল জীবন ?
স্বপ্নে এখনো তার চলে যাওয়ার শব্দ

তৃষ্ণা যার পোষা পাখী
তার টেলিফোনে শুধু ভেসে আসে
বৃষ্টিপাতের শব্দ।

কার্তিক দেবনাথ

সহস্রার অন্ধকার

বিরক্ত ব্যথাতুর আমরা তো সেই নিহিত অন্ধকারের তখন
ইড়া পিঙ্গলা সুষুম্নায় থেকেও সহস্রার-এ ঢাকি ঘোমটায়
কিছু ছিলো না আমাদের, এখনো কিছু নেই
হাতে সেই অনন্তকালের একটা আটপৌরে ভোঁতা নোড়া
থিতু হতে হতে শরীরে মেখেছি এলাচ লবঙ্গ দারুচিনির মতো
কিছু গাছপালা পাখিদের গান
ভেবেছি অনেক এই জল ফল মূলের আস্বাদ
জলের মাছের মতো বুদ্বুদের শব্দে যেন মন্দিরের ঘণ্টা বাজিয়েছি

কিছু ছিলো না আমাদের, এখনো কিছু নেই না জেনে
দৌড়াই সেই ঘণ্টার পিছু পিছু
শব্দ একটু ম্লান হয়েছে দেখে কান্নায় চুলুচুলু খুঁজি রিক্তস্বাদ
মাটির গহ্বর
মাটি এখন বেলুনে ফেঁপে আসে, বেলুনে ফেঁটে যায়
কেবল ডাঁটা আর ডাঁটায় লগবগে পাতা ঝরে
স্বাদ না পেয়ে নুন লঙ্কা আদায় তাক্তবিরক্ত ভোক্তা
ভিক্টোরিয়ায় দেখে সাহারা
তবু একবারও ভাবে না
আমরা তো সেই নিহিত অন্ধকারের তখন
ইড়া পিঙ্গলা সুষুম্নায় থেকে ঢাকনা খুলি সহস্রার।

মেঘ মুখোপাধ্যায়

গ্রন্থের ভিতরে বাহিরে

বার্তা

গ্রন্থের ভিতরে কিছু বার্তা ছিলো
আর শতকের গন্ধ মেখে কতিপয় বুড়ো উইপোকা
পূর্বপুরুষের মতো ব'য়ের ভিতরে ;
তাহারা আমার আগে ওই বার্তা চেখে দেখিয়াছে
কিছু পাতা ছিন্নভিন্ন অনেক অক্ষর কাটাকাটা
এবার আমার হাতে স'পে দিয়ে নিশ্চিন্ত হল
নাকি তাহাদের জ্ঞানের জগতে আমি পা দিয়েছি
বলে তারা মর্মন্তুদ জ্বলে—বুঝতে পারি না

মাঝরাত

এখন গ্রন্থের মধ্যে মাঝরাত
পাতা খোলা মানা
ঘুমুচ্ছে ঘুমোক জাগিও না
সারাদিন অনেক পড়েছো এমনকি বিকেলে
বিকেলে বেড়াতে যাওনি—পাতা খুলে
গোঁজ হয়ে বসেছিলে কোণে
হাহন্যের মতো তুমি অনেক গিলেছো
এখন রাত্রিকালে ঘুম ভাঙিও না
ঘুমুচ্ছে ঘুমোক

গ্রন্থের ক্লান্তি আছে বিরক্তি রয়েছে
পাঠক কি বোঝে ? ব্যবহার করে নিতে পেলে
কিছু খেয়াল থাকে না
রাত্রে ঘুমের মধ্যে গায়ে হাত দিলে উহাদের
ব্যথা লাগে গাছের মতন।

ইন্দ্রজিৎ সরকার

প্রজন্মের রুদ্ধশ্বাস

প্রজন্মের রুদ্ধশ্বাস শোনে
প্রজন্ম বেঁচে উঠতে চায়
কেঁপে উঠতে চায়
সকালের সেই মৃদু রোদে
কোনো এক বিমল বাতাসে
প্রাণ খুলে নেচে উঠতে চায়।

শুধু বিষাক্ত বাতাস কেন ?
ধ্বস্ট মাটি, ক্লিষ্ট জল
প্রাণহীন পরিবেশ কেন ?
কোন অপরাধে আজ
প্রজন্ম আমার
বায়ুহীন বাতাসের ক্রুদ্ধ অভিশাপে
ক্রুশবিদ্ধ হয় ? কোন অপরাধে

মানুষের বিমর্ষ প্রাণ
জীবনের জয়গান বুকে নিয়ে
মূক হয়ে থাকে ?
কার অভিশাপে
মানুষ মানুষ নয়,
জন্তু এখনো ?
প্রজন্মের রুদ্ধশ্বাস শোনে।

শতাব্দীর দীর্ঘতর চেতনার কাছে

সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়

'……কারণ আমাকে অনুভব করতে হয়েছে যে খণ্ড বিখণ্ডিত এই পৃথিবী, মানুষ ও চরাচরের আঘাতে উত্থিত মৃদুতম সচেতন অনুনয়ও এক এক সময় যেন থেমে যায়,—একটি পৃথিবীর অন্ধকার ও স্তব্ধতায় একটি মোমের মতন জ্বলে ওঠে হৃদয় এবং ধীরে ধীরে কবিতা জননের প্রতিভা ও আস্বাদ পাওয়া যায়। এই চমৎকার অভিজ্ঞতা যে সময় আমাদের হৃদয়কে ছেড়ে যায় সে সব মুহূর্তে কবিতার জন্ম হয় না, পদ্য রচিত হয়।'

এ হল কবির গদ্য, কবিতার নির্মাণ রহস্যের একেবারে ভেতরে-ডুব-দেওয়া অনুভবের উন্মোচন। ব্যাখ্যাতীত এমন কিছু কথাই বলতে চাইছিলেন জীবনানন্দ তাঁর 'কবিতার কথা'য়। বলতে বলতে কবিতার অন্তর্গত এক ধরনের মগ্নতার দাবিই যেন উঠে আসছিল তাঁর উচ্চারণমালার অন্তরাল থেকে। ছায়াচ্ছন্ন এক ঘোরের কথাই ভাবছিলেন তিনি, পার্থক্যের সীমারেখা টানছিলেন বোধের কবিতা আর লঘু অগভীর পদ্যের মধ্যে। কথাগুলোর মধ্যে একটা প্রচ্ছন্ন অসহায়তার আর্তিও কিছু কম ছিল না; কম ছিল না বলেই, যে সব মুহূর্ত কবিতার জন্ম দেওয়ার প্রতিকূল ছিল তার মধ্যে একটা দীন শূন্যতা তিনি অনুভব করেছিলেন। সে ধরনের অভিজ্ঞতায় লগ্ন হওয়াটা পদ্যকারের কাজ, ধরে নেওয়া যেতে পারে। একটি বোধের কবিতার সামনে হৃদয় জ্বলে ওঠে মোমের আলোর মতন, স্তব্ধতায়, আঁধার রহস্যে, নিথর নিশ্চেতন আচ্ছন্নতায়। কথাগুলো বিশ্বস্ততা সঞ্চারে জীবনানন্দই বলতে পারতেন: উত্তর-রবীন্দ্রযুগে তাঁর হাত ধরে এগিয়ে গিয়েই আমরা বুঝতে পেরেছিলাম চেতনা আর বোধির সাযুজ্যে কোন্ অতলান্ত তন্ময়তার জগতে পৌঁছে যেতে পারে একটি শুদ্ধ কবিতা। 'মাথার ভিতরে/স্বপ্ন নয়—প্রেম নয়—কোনো এক বোধ কাজ করে' বলেই কবি ছুঁতে পারেন আলো-অন্ধকারের ওই ব্যাখ্যাতীত বিভাব। আর তখনই নিঃশব্দে তৈরি হয়ে যায় এক দুরতিক্রম্য দূরত্ব,—কবিতার সঙ্গে পাঠকের, অনুভবের সঙ্গে বিশ্লেষের, সংবেদনার সঙ্গে অনুপুঙ্খ মূল্যায়নের। আমরা বুঝে নিতে পারি, কবিতাকে আর ভেঙে টুকরো করে বুঝে নেওয়া যাবে না, অনুভবে যেটুকু আত্মস্থ করে নেওয়া যায়, রক্তে মিশিয়ে নেওয়া যায় যেটুকু উপলব্ধির অতীন্দ্রিয়তা, সেখান পর্যন্তই যাওয়া ঘটে উঠবে আমাদের, বোধের অতীত তন্ময়তার ওদিকে আর নয়।

'সুচেতনা, তুমি এক দূরতর দ্বীপ/বিকেলের নক্ষত্রের কাছে;—এ পঙ্‌ক্তিকে আলোচনার নিঃসাড় অক্ষর সাজিয়ে আর কতটুকু বোঝানো যায়? হাতে কলম ধরেও কত নিরুপায় হয়ে যাই আমরা যখন আমাদের সামনে আলো-অন্ধকারের এই মহান দোতনা জেগে ওঠে—

অনেক আঁধার আলো দেখেছি, তবুও
আরও এক বড় আলো অন্ধকারের প্রয়োজন
এখন গভীর ভাবে বোধ করে মন
আকাশ প্রান্তর পথ নক্ষত্রলোকের কাছে গিয়ে

এ হল গভীরভাবে বোধ করার কবিতা, এ বোধ আমাদের স্পষ্ট চেতনার জগত থেকে উঠে আসেনি; মনের সংজ্ঞান ও অসংজ্ঞান সত্তার শিকড়ে তার জন্ম বলেই তার অন্তর্গূঢ় ব্যঞ্জনা স্থূল বুদ্ধির অগম্য। আর ঠিক এ কারণেই একসময়ে মুষ্টিমেয় পাঠক ছাড়া বাকিদের অবাধ ছাড়পত্র ছিল না এর ভেতরে, আরো ভেতরে প্রবেশের। আমি বলেছি দুরতিক্রম্য দূরত্ব, সেটাই ছিল ভাল, তাতে কবিতাই পাঠককে তন্ময় করে রাখত, স্তব্ধবাক হয়ে যেত পাঠক, একটা বেড়ার প্রাচীর গড়ে উঠত বোধ আর ব্যাখ্যার মধ্যে, অনুভব আর ব্যবচ্ছেদের মধ্যে, ধ্যান আর সমীক্ষার মধ্যে।—

সে কেন জলের মত ঘুরে-ঘুরে একা কথা কয়!
অবসাদ নাই তার? নাই তার শান্তির সময়?
কোনোদিন ঘুমাবে না? ধীরে শুয়ে থাকবার স্বাদ
পাবে না কি?

এই অন্তর্মুখী স্বগত সংলাপের প্রশ্নার্ত বিভঙ্গগুলি বুঝে নেবে যে-কোনো পাঠক? এটাই কি কাম্য ছিল সেদিন? একটা স্তরের পর তন্ময়তার সূক্ষ্ম আস্তরণকে চেয়ে দেখার সাহস কি অর্জন করে নিতে পারত যে-কোনো কবিতাক্রান্ত পাঠকসমাজ? সম্ভবত নয়, আর নয় বলেই তন্ময়তার ঘোর জিনিসটা টিঁকে ছিল, কবি আপাত স্তর থেকে হারিয়ে যেতেন অন্যমাত্রিক স্তরে, ঝাপসা দূরত্বে, সাংকেতিকতায়, আর বিমূঢ় পাঠকের সংখ্যা কমে যেত অল্প থেকে আরো অল্পে। 'That serene and blessed mood'—যে গোত্রের কবিতার জন্ম দেয়, তার বোদ্ধা পাঠক হাতে-গোনা সংখ্যায় প্রার্থিত ছিল।

আজ কবিতা বিস্ফোরণের যুগ, তার ফলন বেশি, বেশি প্রসারিত পাঠকের সংসার। চর্চায় প্রবেশাধিকার ঘটেছে অনেকের, পাঠকও যেন বড্ড বেশি বুঝে

নিতে চাইছে কবিতার ভেতর মহল, তার হাড়-মাংস-মজ্জার সংবাদ। তাতে কি অবাক্ত তন্ময়তার জগত থেকে ক্রমশ দূরে, দূরবর্তী ঠিকানায় চলে যাচ্ছে না আমাদের ভালবাসার, ভালবাসবার কবিতা? প্রশ্নটা তোলা যায় দুদিক থেকে: কবিতা থেকে তন্ময়তা অন্তর্হিত হল বলেই কি পাঠকের সংখ্যা বেড়ে গেল আকস্মিক? নাকি সংখ্যাটা বাঞ্ছিত আয়ত্তে থাকলে আমরা বোধের কবিতা নিয়ে, রহস্যময় কবিতা নিয়ে আরো একটু সুখী হতে পারতাম? সকলেই পাঠক নয়, কেউ কেউ পাঠক—আপ্তবাক্যের আদলে এমন একটা মন্তব্যে বিশ্বাস স্থাপন করার সময় বোধহয় খুব জরুরী হয়ে এসেছে আমাদের এই মুহূর্তে। অতি সুগম হয়ে গেলে, এমনকি অনায়াসবোধ্য হলেও সে কবিতার অপমৃত্যু ঘটতে আর বাকি থাকে কোথায়? যে কবিতা প্রথম পাঠেই উন্মুক্ত, তার আর আন্তর দাবি কতটুকু? সমস্ত ইন্দ্রিয় দিয়ে তাকে ছুঁলেই যদি সে তার গুণ্ঠন এক ঝটকায় খুলে দেয় চোখের সামনে, তবে রহস্যের অপ্রকাশ্য গোপনতা আর অক্ষত থাকবে কি করে? কোনো সংবেদী পাঠকও সেই তন্ময়তাহীন, আবেগচ্যুত কবিতার দিকে আর ফিরে তাকাবে কি? ১৩৭১-র 'কৃত্তিবাস' পত্রিকায় এই অভীপ্সিত কবিতা রহস্যের দিকেই আঙুল তুলে দেখাচ্ছিলেন এক কবি:

> যে কারণে রহস্যময়তা মানুষকে কষ্ট দেয়, সেই একই কারণে
> কবিতায় দুষ্প্রবেশ্যতা আমাদের অতৃপ্তিতে ভোগায়। তবু
> অ-পদার্থ কুটিল কবিতার আপাত জটিলতার কথা বাদ দিলে,
> আমরা, পাঠক বা কবি, সকলেই চাই, কবিতায় রহস্যময়তা
> থাকুক, অগোচরতা থাকুক, গোপনতা থাকুক—ঐসব নিয়ে
> কবিতা আমাদের উন্মুখতার টানকে জাগিয়ে রাখুক—তাতে
> সে যদি দুর্গম হয়, দুষ্প্রবেশ্য হয়, তাও স্বীকার করব। কবিতার
> এই এক চিরন্তন সমস্যা। কবি একদিকে চান কবিতায় নিজেকে
> উন্মীলিত করতে, অন্যদিকে কবিতাকে চান গোপন করতে! সত্যি
> কী চান তিনি?—গোপন করতে, না গহন করতে?

এই প্রশ্নের সহজ মীমাংসা হয় না, এবং হবার নয় বলেই কবির এই যুগপৎ দ্বৈত আকাঙ্ক্ষা প্রত্যাশিত হয়ে থাকে অনুভবী কবিতার গভীরে, 'বৃষ্টি ভেজা বাড়ির মত রহস্যময়' সংকেতে জেগে ওঠে কবিতা, আলো আর ছায়ায় সংবৃত হয় দিগন্তর, 'বৃষ্টি ঝরে চৈতন্যের বোধে/আবার আকাশ ভরে রোদে' কিংবা 'মধ্যাহ্নের রিক্তপটে

রৌদ্র লেগে/ঐ দেখ বৃক্ষচ্ছবি আছে জেগে। /ধ্যানের মতন/ বিশুদ্ধ তাকেই দেখ, মন।'

এই ধ্যান আর বোধের জগত, তন্ময়তা আর ঘোরের পৃথিবী থেকে কি দূরতর কোনো ঠিকানায় চলে যাচ্ছে আজকের কবিতা? প্রকাশ সর্বস্ব পারি-পার্শ্বকে প্রচার মাধ্যমের স্থূল অজস্রতা তো কিছু কম নয়; বহিরঙ্গ আয়োজনে কবিতার প্রসার ও ব্যাপ্তি ঘটেছে উল্লেখযোগ্য; তাৎক্ষণিক জনপ্রিয়তার সূত্রে তার কদরও বেড়েছে অনেক গুণ। কিন্তু অন্তরালে ঘটছে অন্য অঘটন: অনুষ্ঠানের পর অনুষ্ঠানে মনোরঞ্জনের দাবি মেটানোর পথ ধরে কয়েকটি নির্দিষ্ট কবিতা একই মেজাজে পুনরাবৃত্ত হতে হতে আমরা ক্লান্ত বোধ করছি; ব্যবহৃত ব্যবহৃত ব্যবহৃত হয়ে তার বহুমুখী ব্যাখ্যাসম্ভাবনা যেন ক্রমশ ক্ষয় হয়ে যাচ্ছে, তার শরীর থেকে রহস্যের ঘোমটা যেন খসে পড়ছে অনেকটাই, অস্পষ্ট চেতনার থেকে বোধে, বোধ থেকে Vision-এ হারিয়ে যাবার, ময় হবার পথ যেন আমরাই রুদ্ধ করে দিচ্ছি দিনে দিনে, স্বেচ্ছায়। বড্ড বেশি স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হয়ে যাচ্ছে সব। ছিঁড়ে যাচ্ছে মায়াবী রহস্যের অগোচর রোমাঞ্চ। অথচ আমরা জানি উচ্চাঙ্গের কবিতার খসড়া তো এক বাঞ্ছিত ধূসরতার আশ্রয়েই সম্ভব করে তুলবে তার সম্পন্ন নির্মাণ। যাবতীয় উত্তরণ। চল্লিশের এক স্বাতন্ত্র্যচিহ্নিত কবি এই সত্যের ওপরই আলো ফেলতে চেয়েছিলেন একদিন, আমরা উপলব্ধি করে নিয়েছিলাম—

> কবিতার পাণ্ডুলিপি ধীরে ধীরে তৈরি হয়ে ওঠে।
> বন্ধু ও স্বজনবর্গ
> ক্রমে আরো দূরে সরে যায়।
> ক্রমশ অস্পষ্ট হয় যৌবনের আনন্দ-যন্ত্রণা।
> মনে হয়,
> যৎপরোনাস্তি যে-শব্দনিচয় একদা খুবই অর্থবহ ছিল,
> আজ তিলমাত্র অর্থ বহন করে না।
> দিন দীর্ঘ হয়, স্মৃতির ভিতরে
> পোকা হাঁটে, হাওয়া ঘুরে যায়।

কবিতার ক্রমশ এই অস্পষ্ট হয়ে যাওয়া—এ সম্পর্কিত চিরায়ত বিশ্বাস আমাদের আজো টলে যায়নি, এবং যায়নি বলেই এই মুহূর্তের অন্তত কেউ কেউ এমন উচ্চারণ গড়ে তোলার উপলক্ষ্য তৈরি করে নেন, 'নিশ্চল, অক্ষরহীন অন্ধকার—প্রকৃত কবিতা। যা প্রাজ্ঞ, যা অবর্ণনীয়, রহস্যময়।'

কথা হচ্ছিল এই প্রজন্মের প্রতিষ্ঠিত এক কবির সঙ্গে। অ্যান্টি পোয়েট্রিতে বিশ্বাসবান তিনি, কবিতা-কবিতা ভাব থেকে, এক জাতীয় শিল্পিত কৃত্রিমতা আর অলংকৃতির আঁচ থেকে বাঁচাতে চান তিনি এই সময়ের কবিতাপ্রয়াস আর প্রবণতাকে, কথ্য ভাষারও বিকল্প হিসেবে কট্টর শব্দচর্চায় তিনি এগিয়ে যেতে চান অনেক দূর এবং গেছেনও। প্রসঙ্গচ্ছলে তিনি এও বললেন, 'দেখবেন, কবিতাকে বেআব্রু করতে করতে একদিন এর চৌহদ্দির মধ্যে আমি টেনে তুলব নর্দমার পাঁক।' আমি বলেছিলাম, 'বেশ, কিন্তু তারপর? চূড়ান্ত উত্তরণ আর শান্তায়ন ঘটাবে কিভাবে, কোন্ পথে?' মেলেনি উত্তর। আমি তার হয়ে জবাব যুগিয়েছিলাম 'চেতন স্যাকরা'র তিনটি পঙ্‌ক্তি উদ্ধার করে—

……তোমাদের অতীব নোংরা গলিতে,
সোনার সুন্দর, রুপোর রূপকার, এই নর্দমার দোকান দেহলিতে
ধ্যান বানাই। এই আমার উত্তর।

এইভাবেই তো উত্তরণ ঘটবে, জড়তা থেকে চৈতন্যে জেগে ওঠার উত্তরণ, জীবন-বীক্ষণ থেকে আত্মময়তায় উত্তরণ, বোধ থেকে vision-এর দিকে এক অভিযাত্রা।

আচ্ছন্নতায় আপ্লুত হওয়ার মত কবির স্বরচিত মগ্নতাকে বাংলা কবিতা অস্বীকার করেনি কোনদিন। এই পথেই সে পৌঁছতে চেয়েছে শব্দ থেকে শব্দহীনতায়, নিছক মগ্নতা থেকে নিবিড় তন্ময়তায়। এই সূত্রে শোনা যাক পঞ্চাশের মননধর্মী এক কবির অনুভূতিঋদ্ধ কয়েকটি কথা—

সন্ধেবেলার কাক আমার ছাদের কার্নিসে কিছুক্ষণ চুপ
করে ব'সে, তারপর নিঃশব্দ নিরুদ্দেশের দিকে হঠাৎ ডানা মেলে
দিলো; শীতের দুপুরে একটা বেরাল চকিতে পাঁচিল থেকে লাফ
দিয়ে অদৃশ্য হ'য়ে গেলো; বিকেল-সন্ধের সন্ধিক্ষণে কাচের
জানলার পর্দা সরাতেই অলৌকিক রঙে ভরে গেলো ঘরের দেয়াল;
পার্কে একজন তরুণী তার প্রেমিকের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ হেসে উঠলো,
তারপর রুমাল বিছিয়ে গাঢ়-সবুজ ঘাসের ওপর বসে পড়লো; চলন্ত
ট্রেন থেকে চোখে পড়লো, সাইকেল চড়ে একদল যুবক উদাস রাস্তার
আড়ালে হারিয়ে গেলো;—এই সমস্ত আপাত-তুচ্ছ, ছোটো ছোটো
ঘটনার কম্পমান হয়ে ওঠে অন্য একটি যবনিকা, আবরণ—যার
আড়াল থেকে নির্গত হয় এক ধরণের রহস্যানুভূতি। একেই আমি
আধ্যাত্মিক আয়তন বলতে চাইছি।

ঠিক এইভাবেই প্রার্থনা মঞ্জুর করে আমাদের কবিতা যখন বেদনায়-সংবেদনায় পৌঁছে যেতে চায় শব্দহীন নৈঃশব্দ্যে, বিকেল সন্ধের সন্ধিক্ষণে নিস্তব্ধ নিরুদ্দেশের দিকে, হারিয়ে যায় উদাস রাস্তার আড়ালে, আমরা সুখী বোধ করি, একটা অকারণ রহস্যের সামনে দাঁড়াতে আমাদের ভাল লাগে। কারুর কবিতায় অতিরিক্ত উজ্জ্বলতায় ঝলমল করে ওঠে রোদ্দুর, কারুর কবিতায় বড্ড বেশি অন্ধকারের বিষণ্ণতা। এরই ফাঁকে আমাদের জেনে নিতে হয় 'আলো যেখানে কালোর বুকে মেশে' সেই আলো-আঁধারি হাফটোন জগতটার অবস্থান কবিতার শরীরে ও আত্মায়। আর ঠিক সেই মুহূর্তেই আসন্ন হয়ে ওঠে উচ্চারণ, কবিতার গর্ভ থেকে জন্ম হয় অনুভবের, স্বগত সংলাপ মাত্রা পায় মিতকথনে, শব্দ পেরিয়ে শব্দের ওপারে চলে যায় মগ্ন উপলব্ধি,

সাতদিন কবিতা না লিখতে বসার কষ্ট
বুকে বিঁধে আছে। এখন প্রস্তুত হই,
মনে মনে বলি: তৈরী হও,
শুকনো পাতা চলে যায় উত্তরে-হাওয়ার পিছু পিছু,
তুমি সেইভাবে যেন ছড়িয়ে পড়ো না—
বরং, গর্তের ভেতর থেকে যেভাবে বাদাম এনে
কাঠবেরালীর শিশু শব্দ করে খোসা ভেঙে ফেলে,
তুমি সেইভাবে আজ শব্দ ভেঙে শব্দের ভেতরে চলে যাও,
এখন, অষ্টম দিনে লিখে ফেলো একটি কবিতা।

পৃথিবীর অন্ধকার স্তব্ধতায় একটি মোমের মতন জ্বলে ওঠে আমাদের হৃদয়। একটি নির্মাণ গর্ভবতী হয়।

সুশীল সিংহ

ফুলুট

একটা ফুলুট আছে। সাতপুরুষ আগে
কেউ বাজাতেন। চেয়ে থাকি। তাপ নি। ঠোঁটে
চাপি। বাজাতে জানি না।
আমি ও ফুলুট……
মাঝখানে ঘুমিয়ে রয়েছে মৌনী।

মাঝরাতে তার গায়ে হাত দিলে মনে হয়
ঠাকুরঘরে রাখা দক্ষিণামুখী শঙ্খের মতো, জলধি
থেকে আসা ঝাউবনের বাতাস
'হরিবোল' দিতে দিতে
আপন শবের সামনে খই ছড়াচ্ছে—

ভায়েদের হাতে ভাত খেয়ে, সাত পুরুষের
ফুলুট বুকে
জয়দেবের মেলায় বসে আছি

রত্নেশ্বর হাজরা

দৃশ্য-দৃশ্যান্তরে

একটা দরজা খুলে যেতে থাকে হঠাৎই
একটা দরজা অচেনা মাঠের দিকে
অচেনা পথের দিকে
একটা পাহাড়ের দিকে
পাহাড়ের নিচে একটা রহস্যময় সরাইখানার দিকে
অচেনা সমুদ্রের পাড়ে ভিজে বেলাভূমির দিকে
একটু একটু এবং নিঃশব্দে
একটা দরজা
খুলে যেতে থাকে……
এবং তারপরেই
হঠাৎ একটা খাদের পাশে দাঁড়িয়ে পড়ার মতো
একটা চোরাবালিতে কোমর অবধি আটকে যাওয়ার মতো
দুই হাত পিছনে বাঁধা আর সামনে
বিষ-মাখানো তীরের ফলা এগিয়ে আসছে—এমনি
একটা কিছু
যেন আড়াল করে ফেলছে
হঠাৎ খুঁজে পাওয়া রহস্যময় পাহাড়তলীর
সব কিছুকে—

মাছি

সে ভাবল, আমি কিছুই জানি না,
আমি সবই জানি, তবু বললুম না—

"আপনার সঙ্গে আলাপ করে ভাল লাগল,
আপনার কথা অনেক শুনেছি।"

"আমিও আপনাকে দেখেছি,
অমুকের সঙ্গে আপনার কাছে গেছি
অথচ কথা হয়নি।"

তার কোমরের অলৌকিক রেখার ওপর
একটা মাছি এসে বসল—

মাছি সংক্রামিত করে—

এই প্রথম মাছি দেখে ঘেন্না হল না—

মাছিটা উড়ে এসে
আমার ঠোঁট ছুঁয়ে
তার বুক ছুঁয়ে

ইচ্ছা হল বলি, আমার অসুখের পালা শুরু হল,
ইচ্ছা হল, তার কি বলতে ইচ্ছে করছে তা জেনে নিই—
কেউ কিছু বললুম না,
মাছিটা এখানে ওখানে উড়ে বসতে লাগল—

জল

যে মানুষটি রাতে না ঘুমিয়ে
কবিতা লেখে
একুশ শতকের দূষণ বিমুক্ত সমাজের কথা ভাবে
যে বন্ধুত্বের বৃষ্টির জন্য
গ্রীষ্মের ঘাসের মত উন্মুখ হয়ে থাকে
তাকে আর যাই বলো
কমিশনখোর ফেরেববাজ বলে চিহ্নিত কোরো না

যে মানুষটি শুদ্ধ ভালোবাসার জন্য
যৌনতাহীন বছরের পর বছর
কাটিয়ে দিল
সেই উন্মাদ সন্ন্যাসীর গালে
পারলে দুফোঁটা বৃষ্টির জল হোয়ো

কবে তুমি তার নিঃসঙ্গতার উট হবে
এই মরুভূমি পার করে
পৌঁছে দেবে সৃষ্টিকালের প্রথমে
জলময় এক বিহ্বল ভোরের আলোয় ··

ক্ষিতীশ দেব শিকদার

হারানো আয়না

ঘোরানো সিঁড়ির মাঝখানে
আমার আয়না হারিয়েছে—আমার এতদিনের আয়না
আমাকে প্রতিফলিত করে দেখিয়েছে—
আমার চেহারা খুব সুন্দর নয়
আমার কণ্ঠ ঠিক গানের উপযুক্ত নয়
এবং আমি অনিচ্ছা সত্ত্বেও আমার পূর্বপুরুষের হাতের নাগালে চলে যাচ্ছি।

ঘোরানো সিঁড়ির ঠিক মাঝখানে কোন অসাবধানতাবশতঃ আমার আয়না হারালো ?
ভাবতে ভাবতে আমার সমস্ত শরীর কেঁপে উঠেছিলো
আমি আত্মবিস্মৃত হয়ে গিয়েছিলাম—

দেখ বৎস, আজো আমি আমার হারানো আয়নার দিকে চেয়ে বসে আছি।

আমাকে যে ভয় করে ভয়

কোনদিন সন্ধ্যে হয়ে এলে যদি ভয় পাও
নিকটে কোথাও আছি ডাক দিও
কোন দিকে পালাতে যেও না
আসুক সশস্ত্র যুদ্ধে এক লক্ষ সেনা—
নিকটে কোথাও আছি এক ডাক দিও,

তপ্ত-রঙ বীর্য-দীপ্ত সাহসই আমার পরিচয়
কতোবার প্রমাণিত আমাকে যে ভয় করে ভয়

অরিজিৎ দাশগুপ্ত

আমাকে দিও না কিছু

আমাকে দিও না প্রেম
ছুঁড়ে দাও গণ্ডী কাটা রেখা
বিস্তৃত শৃঙ্খল থাক পাঁজরে জড়ানো
আর কিছু আদ্যোপান্ত সুখ ॥

আমাকে ছুঁয়ো না তুমি
খুলে নাও প্রাচীন মুখোশ
আকাশের নীল যদি দেখি।
শান যাক গিলোটিন সুরে ॥

সূর্যের চাপা তেজ আলো
পাথরকে ভেঙে করে জল
গড়ানোর পথে নেই বাধা
ভালোবাসা ? অনিকেতগামী ॥

পবিত্র আচমন সেরে
নাভী থেকে উঠে আসা ওঁ
আমার শতাব্দী চলে যায়
ফেলে গেছে শ্বাস ও আগুন ॥

সিঁড়ি

জলে ডুবে আছে সিঁড়ি
কতোদূরে গিয়েছে ওই সিঁড়ি জলের গভীরে,
জলের সঙ্গে পৈঠার কি কথা কানাকানি ?
সেই ধ্বনি
শুনবো ব'লে পাড়ের উপর ব'সে আছি।
একদিন ওই সিঁড়ির শেষ পৈঠায়
রমণীরা নিবিড় হতেন বৈকালিক বৈঠকে।
খুব ঘষে-মেজে পায়ের নূপুর
চক্‌চকে করতেন কোনো নববধূ।
আর রূপোর কলসি ভাসিয়ে দিতো কুমারীরা।
জলে ডুবে আছে সেই সিঁড়ি
হয়তো ভেঙেচুরে ক্ষয়ে গিয়েছে কালের প্রহারে।
অশোকে পলাশে রাঙা হয়ে থাকতো যে ঘাটের চাতাল
আজ অশোক পলাশের ছায়াটুকুও নেই।
শ্যাওলা জমেছে ইটের খাঁজে-খাঁজে,
শ্যাওলা শুধু।
বুকে নিয়ে অতীতের বহু স্মৃতি
সিঁড়ি ডুবে আছে জলে।
কানায় কানায় ওই জল এক একটি পৈঠা
অতিক্রম ক'রে চ'লে এসেছে পাড়ে।
জলের গভীরে ওই সিঁড়ি
আজ কোন্ রহস্যের মূর্তি গড়ে !

ঠুলি

পৃথিবী ঘুরছে সূর্যের চারদিকে
চাঁদ ঘুরছে পৃথিবীর চারদিকে
এই সহজ বৈজ্ঞানিক সত্যটি না জেনেই তুমি
ঘুরে চলেছো ঘানির চারদিকে।
সেও এক ধরণের সত্য
তবে তা বৈজ্ঞানিক না
নিছক সামাজিক।

আমাদের অস্তিত্ব-তরু দাঁড়িয়ে আছে
কঠিন সত্যের মাটিতে
কিন্তু সামাজিকতা
শিকড় ছড়িয়েছে আবহমান অন্ধ সংস্কারে।

হে চির-অনুগত কলুর সেবক
কখনো কি ভেবে দেখেছো
পৃথিবী ও চাঁদের চোখে যা নেই
সেই আশ্চর্য ঠুলি কেনই বা তোমার চোখে বাঁধা ?

দর্শনার শরীর ২৯

ফায়ার প্লেসে জ্বলত মৃদু সুরভিত আগুন, মনে পড়ে তার কাছে বসে মাঝে মাঝে হাত পা সেঁকে নিতাম। সেই কোমল স্পর্শময় অগ্নিগন্ধ থেকে প্রায় এক বছর হল দূরে সরে এসেছি। একটা না একটা বইএর উপর যখন ঝুঁকে বসে থাকতাম তখন আমার চারদিকে যেন জাদুবলয়। ঢেউ খেলানো বাড়ীর ছাদ আর অর্ধ-কৌণিক চিমনি, কসমিয়া ফুলদের বেগুনি রঙের অজস্র আবেদন, আরো দূরে 'দোলনচাঁপা' নামক পাহাড়-চূড়া-শ্রেণী, রোদের স্বচ্ছ চক্ষুগুলিকে দেব-চক্ষুর মত অর্থবহ মনে হ'ত। এসময় একদিন ক্লাইমল নামে পাহাড় কোলের ছোট্ট একটা গ্রামে গিয়েছিলাম। চারদিকে মৃতের সমাধি, ক্রুশ ও নারী-মাতার বিমূর্ত ইঙ্গিত, সিঁড়ি বেয়ে নামতে নামতে হঠাৎ চোখে পড়ল হরিণমাংসের বাজার। আশ্চর্য আগে এ পথে কখনো আসিনি। এ পথে দ্বিতীয়বার আসবার মত সময় আমার হাতে নেই। শান্তিলতার আমন্ত্রণে এসেছি তার কুটিরে। ঘরের তৈরী এক জাতীয় তৃণঘাসের বীজশস্য থেকে উৎপন্ন মধুর মদ্য পানপাত্রের কানায় ঠোঁট রেখে প্রচুর পান করলাম। মাংস কিমার তৈরী অদ্ভুত পিঠে অল্প-সহযোগে সঙ্গে ছিল। শান্তিলতার সুগঠিত হাঁটুর চারদিকে ফুল-আঁকা রঙীন কাপড়ের ঘাঘড়া, তার বুকের ভিতর আদিম ঐশ্বর্যের ঝিলিক। কতদিন ভেবেছিলাম তার সঙ্গে আমার মিলন হবে। আজ সেই মুহূর্ত এল। কিন্তু তবু আমি নিকটস্থ মৃতদের কথা ভুলিনি। বুকের ভিতর অনুতাপ এবং ভুলে যাওয়া যৌন-আবেদন ও যৌনগন্ধের কথাশৈলী। গন্ধপথে আমার এই অভিসার। আর আমি জানি দু'দিন পরে আমি থাকবো আমার প্রিয় শহরে। মননের ভিতর সংগ্রহ করেছি কত নারীছবি, বৃক্ষছবি, চিত্রের মাধ্যমে কল্পনা করতে আমার ভালো লাগে। স্বপ্নের ভাঁড় ঠেলে হাঁটা দুরূহ বস্তু, দর্শনা আমি আমি একটা সরলরেখা খুঁজছি। সঠিক উপাদান ও উদ্দীপনাগুলি খুঁজে নিতে হবে। সস্তা ভাববাদ আজ থেকে বর্জন করলাম। বুদ্ধিপ্রাধান্য ও কঠোর নৈর্ব্যক্তিকের ভঙ্গী আজ থেকে আমার আশ্রয় হল। গাছপালা ফুল ও কুয়াশার সতেজ গন্ধ, শীতের কালে ঠাণ্ডা তুষারকণার অলক্ষ্য উপস্থিতি নিথর বাতাসে, ঘরের ভিতর আমার বিলীয়মান রজনী; সর্বোপরি নারী, বর্ষ চতুষ্টয়ে তোমাকে ঘিরে আমার

স্পর্শ-ঘ্রাণ ও স্বাদমূলক ইন্দ্রিয়সমূহের প্রবল আলোড়ন আমাকে নির্জনতার কথা স্মরণ করায়। মৃতের গ্রন্থপাঠে বেলা বয়ে যায়, বারান্দায় এসে দেখি দিনের আলোর শেষ কণাটুকুও অপসৃত; এক রূপসী অকাল মৃতের সমাধিতে যেন শেষ একতাল মাটি ছুঁড়ে দেয়া হল। তবু স্বাস্থ্যচর্চার জন্য আমাকে বাইরে যেতে হবে। নারী বাজারের পরণ উদার পথ সমূহের ভিতর দিয়ে এগিয়ে যাব। আমাকে তুমি সুখ দিয়েছ দুঃখ দিয়েছ। দুঃখবোধকে মুছে ফেললাম তীব্র ব্যক্তিগত চেষ্টা ও নেশাদ্রব্যের ব্যবহারে; তখন মনে হল তোমাকে ছাড়াও বাঁচতে পারবো, সিদ্ধান্ত নিলাম কাল ভোরবেলাই ট্রেনে করে চলে যাবো বহুদূরের জল-নগরীতে। বহু দূরের জল-নগরীতে পশু-কুমারীর উদ্যান। সাঁকোর উপর দিয়ে যেতে যেতে উত্তীয়মান বুনো হাঁসদের জলক্রীড়া দেখা যায়, জলের কোথাও শ্যাওলার সবুজ আস্তরণ এবং পার্শ্ববর্তী পামজাতীয় বৃক্ষদের কুহক; হঠাৎ এক ঝলক ভিজে হাওয়ার ছোঁয়ায় প্রবাসে প্রাণ জুড়োলো। আমার সুদূরবীক্ষণে ফুটে উঠল এক বহুদূরবর্তী প্রেমে-পরা মেয়ের আবেগপর্যায়, তার ছোট্ট স্তনদুটি আপেল থেকে উৎপন্ন সিজার মদ্যের পূর্ণ মর্যাদা ও টলমল আভা নিয়ে এল। আমি জ্যোৎস্না রাতে আকস্মিক উন্মাদনাবশত উলঙ্গ এক নারীর কাছে বিচ্ছেদ ও ভালোবাসার গল্প শুনতে চেয়েছিলাম। যাক বিনা যন্ত্রণাতেই তাহলে মধুরের

জটিল সহজ হয়ে যায়

কদম ফুলের সরু সরু পাপড়িগুলি প্রাঙ্গণে
সারাদিন ঝ'রে ঝ'রে পড়ে……

স্কুটারের শব্দ, মেশিনের শব্দ,
টিভি-রেডিও-রেকর্ডপ্লেয়ারের শব্দ অতিক্রম ক'রে এসেছি এখানে—
বস্তুপৃথিবীর কোলাহল অতিক্রম ক'রে এসেছি নির্জনে—

কদম ফুলের সরু সরু পাপড়িগুলি প্রাঙ্গণে
অবিরাম ঝ'রে ঝ'রে পড়ে……
মৃদু এক শব্দ শোনা যায়—

সমস্ত জটিল প্রশ্ন ক্রমশঃ সহজ হয়ে আসে।

আরো তীব্র ভালোবাসলাম

সনেটের মতো লেখা তবু সনেট ছিল না
জল শুধু জল তবু ধারে কাছে সমুদ্র ছিল না
তোমার ঘাড়ের কাছে চিরদিন নিঃশ্বাস নিলাম
তোমাকে আমার বলে তবু কেউ স্বীকৃতি দিল না।

নদীর ওপার থেকে অশ্ব কিনে ফিরে আসলাম
নদী দিল নদী আর গ্রামবাসী এনে দিল রুটি
অশ্বটিকে দিল গম, কারা বলে পৃথিবী খারাপ
আমি আরো তীব্রভাবে পৃথিবীকে ভালোবাসলাম।

ভালোবাসবো না কেন? খোলা চুল, আরো খুলে এসো
কুয়াশা কাটেনি জানি আরো বহু কুয়াশা রয়েছে
দুঃখ আছে, কাঁটা আছে, কত কাঁটা লুকিয়ে হাসছে
অর্ধেক প্রোথিত কাঁটা, আমার মৃত্যুর পরে হেসো।

তোমার ঘাড়ের কাছে চিরদিন নিঃশ্বাস নিলাম
জীবন দ্বিখণ্ড করে তোমাকেই ফিরিয়ে দিলাম।

নিশিডাক

অদূরদর্শী পথ, তবু তুমি ভালোবেসেছিলে
ওষুধের গাড়ি থেকে ওষুধ সরিয়ে ভোররাতে
বাড়ি ফিরতাম, ফিরতাম বলা উচিত হলো না
কখনো তেমন করে ঘরে ফেরা হয়নি আমার।

পাথর নিজের থেকে নামছিল, তাকে থামাবার
কেউ নেই, শুধু চাঁদ, চাঁদ দেখে মেটেকি রসনা?
মা-বাবার খাদ্য নেই, কে তাঁদের বলেছে দাঁড়াতে
থালা হাতে? ওগো নিশিডাক, কেন তুমি এসেছিলে?

নিশিডাক এসেছিল দরজায়, আমি জানতাম
কিন্তু আমি অন্য ধাতু, ওষুধের গাড়ি থেকে নেমে
রাজকীয় দাঁড়াতাম, যদি তুমি বারান্দায় আসো,

পৃথিবীকে একবার তুচ্ছ মনে করো, একবার হাসো
ধন্যবাদ হে ঈশ্বর, সব কৃতকর্ম যাক থেমে
বিভাবরী চলে যায়, এসো চাঁদ, চাঁদ নেমে নেমে।

আছি আজ, থাকবো না কাল

বাড়ি ছাড়া বহুদিন, কিন্তু জানি তুমি ভালোবাসো
কেউ নেই আমি যাকে দুঃখের চিহ্ন দেখাবো
চিহ্ন মানে দাগ ; দাগে, কাটাদাগে ভরেছে জীবন
কেউ নেই, শুধু পথ, আমি সেই পথের কাঙাল।

একটা জীবন জুড়ে হাহাকার, এতোটা আকাল
আমি সহ্য করবো না, বায়ুদূত আমার অচেনা
আমার অন্যায় শুধু আমি ফল চিনতে পারিনি
এতো কেন দোষ ধরো, আছি আজ, থাকবো না কাল।

খাটের তলায় শুয়ে যারা বড় হয়, বিছানায়
তারা ওঠে বহুকষ্টে জীবনে দুবার, মৃত্যুর
অব্যবহিত আগে আর পরে, সেই সীমানায়
আমার পথের পাশে চিরদুঃখী জনসাধারণ
একটু জায়গা চেয়েছিল রাত্রে কিছুটা ঘুমোতে

তবু পথ ভরে উঠেছিল চিহ্নে, সহস্র চুমোতে।

এমনি করে

এমনি করে দিন চলে যায়
এমনি করে পাতা ঝরে যায়
দূরে কোথাও ঢেউ ভাঙার শব্দ

দিনমান একটা পাখি ডাকে
লাল পাহাড়ের বুকে শালের সারি
হাওয়া শন শন
পথ ঘুরে পথ ফিরে
এই চলে আসা

পাতার শব্দের ওপর দিয়ে
বালির দাগ মুছে মুছে
কোন সীমান্ত পেরিয়ে
কোন আঁধি মাড়িয়ে

এমনি করে যেতে যেতে
মাথার ওপরে আকাশ বেয়ে
ডানার শব্দ
মেঘের টানে ভেসে যায়
মেঘের শামপান।

নদীর দুপারে নগর জেগে থাকে
চোখের আভায় গমরঙা রোদ
গানের ভেতর সুরের পাখি ওড়ে
কথায় থেমে থাকায় ঘাসফুল মিছিমিছি

পথ সরে যেতে যেতে
দিন সরে যেতে যেতে
দুপাশে বিলীন সময়
দুহাতে টংকার আর
গহন অব্যয়ে না পাওয়ার ঋণ

এমনি করে
জীবন চলে যেতে যেতে
এমনি করে……

তুলো উড়ে যাবে

ব্যক্তিকে রাখি ব্যক্তির পাহারায়।
দিন যায়।

দিন পাহারায় যাবে ?
সূর্য উবে গেলে চাঁদ
জ্যোৎস্নার হীরে-চুনি দিয়ে
পৃথিবী সাজাবে।
কে গিয়ে দেখবে ?

কিন্তু উঠে গিয়ে হতবাক
সংস্কৃতি হলে,
সেই ফাঁকে দুষ্ট ব্যাধ, ক্ষুব্ধ প্রতিবেশী
ব্যক্তিকে বিঁধিয়ে যাবে তপ্ত শলাকায়।
ব্যক্তি খসে যাবে।

তবে পাহারাই থাক।
কিন্তু টংকার কোথাও শুনলেই ধনুরীর
ছুটে যেন আঙ্গিকে দাঁড়ায়।

পাহারার ফাঁকে ফাঁকে তুলো উড়ে যাবে।

স্বস্তিকা

হাটুতে স্বস্তিক চিহ্ন ছিল বলে রাজরক্ষী এল
বন্দী করবে—
যমজ বোনের মধ্যে একজন স্বস্তিকধারিণী
অন্ধকার রাত্রি ফুঁড়ে মশাল জ্বললো
অশ্বখুরে শব্দ
ঘুমন্ত গ্রামের নাড়ি জাগিয়ে তুললো
কোন চিহ্ন, কোন রঙ, কোন জাতীয়তা !
ও কি বিষকন্যা !
রাইন নদীর মাছ, নাকি গুপ্তচর
নৌকোডুবি থেকে বেঁচে উঠে এদেশে এসেছে !
নাকি প্যারাসুটে !
কে ওর হাটুতে ঐ প্রতীক এঁকেছে,
যাজ্ঞবল্ক্য নাকি জ্ঞানী ম্যাক্সমুলার
জার্মান না ভারতীয়
কোন কারাগারে যাবে স্বস্তিকধারিণী।

জাগো মন্থর ত্বক

আজ আবার নিরুদ্দিষ্টের উদ্দেশ্যে চিঠি লিখতে বসি আর যা কিছু আমার থেকে দূরে সরে গিয়েছিল একদিন, হৃদয়সমীপে ফিরে আসে। লুফে নিই কাঠপুতুলের জ্যান্ত চোখদুটি, আমি তাকে মুড়ি ও জলের পাত্র ধরে দিলে সে আবার বলে ওঠে, 'বলো, কেন জাগালে আমাকে ?' লুফে নিই আমার বন্ধুর কবিতা। যেখানে সে লিখে গেছে গ্রাম-প্রত্যারণার কথা। অভাবী ও প্রতারক মুখগুলি ধোঁয়ার মধ্যে দেখতে পাই। আজ কতদিন পর, পেছনের ঘোরানো সিঁড়িটি দেখা যায়। যার থেকে নেমে এলে, পাক খেতে খেতে টলে গেলে প্রচুর পুলক উঠত লোকেদের। করুণা উঠত। খুব বৃষ্টি হয় আর ভীষণ আঁধারে চোখ সয়ে যায় বলে আজ চারপাশে আলো হয়ে জাগে। আবার নিরুদ্দিষ্টের উদ্দেশ্যে চিঠি লিখতে বসি—প্রীতিভাজনেষু, গোপনে জানাই আজ, ততটা জরুরী নয় ফিরে আসা, যত এই খুঁজে ফেরাটুকু।

পর্দা

রাত্রি শেষ হলে বিছানা জুড়ে রোদের ছোটাছুটি ;
এই রোদ্দুর মনে করিয়ে দেয়
প্রাত্যহিকের ছোবল ;
রক্তের গভীরে কাঁটা ঝোপের এলোপাথারি নৃত্য।

গরম ভাতের গন্ধ বাতাসময় ;
হাঁড়িতে ফুটন্ত জলের শব্দে
খুশীর হাসি ফোটে
ছোট্ট শিশুর ঠোঁটে।

এই হাসিতেই বুকে বেজে ওঠে বৈশাখের ছন্দ
এবং
কঠিন পথ হাঁটবার
বর্ষার গরাদ ভাঙবার
মনোবল বেড়ে যায়।

কিন্তু তুমি বঞ্চিত, চার দেয়ালই তোমার পৃথিবী
কুয়াশায় জড়ানো তোমার চেতনা ··তোমার ··জগৎ···
সে কারণেই বোধ হয়
পর্দাটা এতো মোটা
এতো দীর্ঘ।

তুমি

এই প্রথম অন্ধকারের ডাকে সাড়া দিলাম না,
মানুষ অন্ধকারে যায় ক্রোধে, ক্ষোভে, অজ্ঞানে
ভালোবাসা পেলে, প্রেম-প্রীতি-শুভেচ্ছা পাশে থাকলে
মানুষ ছুটে যায় নদীর দিকে
ঘুমন্ত মাঝিকে ডেকে বলে ভাসাও নৌকো জলে
চলো যাই, অরুণোদয় দেখি।

বহুদিনের ইচ্ছেগুলো সবুজের সমারোহে
ফুল হয়ে ফুটুক
কতবার দাগ কেটেছি তবু বৃত্ত ছুঁতে পারিনি
আজ বুঝি তুমি আমার ভেতর কেন্দ্র হয়ে গেলে।

ভয়-১

থামচানো মাংস দাঁতে লেগে আছে অবিকল
আমার তাতে নেই অংশ-ইচ্ছা ও ভয়

যে কোনো ভাবেই পারলে পালাও এলিয়েন

ইস্পাতের দাঁতে রক্ত লাগলে ব্যর্থ অনুভূতি হবে
ভেদবর্ণ চক্ষু যাবে ধূসর চশমায় ঢেকে রুমে

ততদিনে এই পৃথিবীতে একজোড়া সুখী দম্পতিও বেঁচে থাকবে না।

ভয়-২

নিঃশেষ ইন্দ্রিয়ের বোধ ফিরে পাচ্ছি আবার
তবে কি ফিরে যাচ্ছি না-মানুষের দিকে—

রকমারি পোষাকে ঢাকছি অন্ধবিন্দু ভয়ে
পায়রার মত ভাবছি—শান্তি-শান্তি সাদা ডানার ঢেউ
গুহা তৈরী হচ্ছে, আগুন জ্বালানোর পথ ভুলেছি

রামানুজ, বালজাক, বুদ্ধের সাথে আমিও ঘুরছি
বোবা যুদ্ধ আর সন্দেহ

স্বপ্ন নয়, লুপ্ত ইন্দ্রিয়ের বোধ
এই তো দিব্যি আমি বেঁচে।

ঘর

রঙীন কাগজ ছিঁড়ে ছিঁড়ে আমরা ঘর বানাই।
ঘরের মাথায় মথের পাখনার মতো চাল,
ঘরের পায়ে হার্মিসের জুতো

সন্ধ্যা হলে আমাদের ঘর উড়তে থাকে আকাশে,
উড়তে উড়তে তার চাল তারায় তারায় গিয়ে ঠেকে,
তারারা ঘুমোয়

ভোরবেলা, শিশিরের রেখা বেয়ে বেয়ে
তার ক্লান্ত ডানা আমরা আরো একবার ভাঁজ করে রাখি

ডাকঘর ও গরিব জানলা

১.
এই বিকেলবেলায়, ধীরে, ঘুমিয়ে পড়ছে আমাদের
ছোটো ও লাজুক ডাকঘর, তার হাতে হলুদ ঝুমঝুমি,
ক্লান্ত বল

আর, রোজকার মতো, আজও ফিরে আসছে পিওনের
নির্জন পাৎলুন, তার চিঠির থলে থেকে
বেরিয়ে আসছে অন্ধকার
২.
এই রাত্রিবেলা, এই চোখ-পোড়ানো অন্ধকারের মধ্যে
আমাদের জানলাগুলি একে একে খুলে গেলো,
তাদের পাল্লারা, ডানা মেলে উড়ে গেলো আকাশে

সেই অন্ধকারে চোখ-বিঁধিয়ে আমরা দেখলাম ;
যেন একটি রেলগাড়ি উড়ে আসছে মাথার ওপর,
তার গায়ে সার সার আলোর জানলা

জলভার

সুদূরে ঘণ্টার শব্দে কেঁপে ওঠে মন
চিঠিতে এখন

শুধু খুঁজি তোমার চোখের জল, ভাষা,
ছায়াময় অন্ধকারে, তুমি যেন ক্লান্ত প্রাণ, অন্ধ ভালবাসা।

হায় প্রিয়, ভাবো আমি নদীর ও-তীরে ?
পুরোনো আয়না, কাঁচ, পুঁতে রাখা যেন সব মাটির গভীরে ?
দেখোনি কি আকাশের ছায়ানভতলে
নিরুদ্দিষ্ট সৈনিকের গাধা, চরি একা একা, বনানীর ধারে ?
স্বপ্নের ওপারে
স্থির নৌকা ভেসে থাকে রহস্যাবিত নীলজলে ?

কি দেবো তোমাকে হে পৃথিবী, জরাকবলিত বেশে,
বলি, ক্লান্ত হেসে
'ও কিছু নেই, কিছু নেই, শুধু ছাই, অর্দ্ধদগ্ধ মুখ
এখানে ঘিরেছে আজ রাত্রির কিনার ঘেঁষে জটিল অসুখ'—
স্বপ্নতাড়িতের মত জেগে থাকা, চাঁদ পারাপার
আমায় নিয়েছে টেনে, ব্যাথ্যার গভীরে এক শান্ত জলভার।

বীজনৌকা

প্রগাঢ় রাত্রির ভাষা, তুলে নেয় ছিন্ন এক প্রাণ,
এই কথা ভেসে যায়, চাঁদের ওপিঠে যেন গান
গেয়ে ওঠে নক্ষত্রেরা, ছায়াময় নীলিমার দেশে—
চরাচরে জেগে ওঠে মানুষেরা স্বপ্নের আবেশে।

'আমাদেরও যেতে হবে দূরে'—শ্রম, ভালবাসা ঘিরে
ঘর বেঁধে নিতে হবে শৃঙ্খলায়, পথের তিমিরে
শরীরের ক্লান্তি ঠেলে, দূরে করে পতঙ্গের ভিড়
মুক্তির অপেক্ষা যেন চেতনায়, স্নায়ুতে অধীর।

'তুমিও কি যাবে সঙ্গে?' বলো তবে, বলো হে চণ্ডাল,
অপেক্ষায় জেগে আছে, স্থিরসত্য, রুদ্র মহাকাল—
শতাব্দী শেষের সূর্য ছিঁড়ে নিয়ে দু'হাতে কঠিন
ভাসাক জলের স্রোতে, বীজনৌকা, আঁধারে বিলীন।

দীপঙ্কর গোস্বামী

দুর্বোধ্য

মাটিতে পা দিয়ে যারা আকাশ ধরতে যায়
তারা জানে না মাটি কাছে না আকাশ,
নিজের ঘর ফেলে যারা বাইরে শান্তি খোঁজে
তারা জানে না শান্তি ঘরে না বাইরে,—
ছোটবেলার হামাগুড়ি থেকে হাঁটা তারপর দৌড়ানো
ভুলে যায় অনেকেই
তাই লং-জাম্প, হাই-জাম্প দেয় রোজ
কিন্তু ওরা জানে না এতে মাটিতেই পড়তে হয় ফের!

ভাস্বতী রায়চৌধুরী

বিদ্যুৎ আমার সহোদর

আমি একদিন আকাশ থেকে মেঘ ফেটে পড়েছি মাটিতে
আমি তো বৃষ্টির ফোঁটা
কিছুটা আমার শুষে নিয়েছে পৃথিবী
বাকিটা এখনো গড়িয়ে চলেছে
লোকে তো আমাকে দেখে বুঝতে পারে না
আমি সরল জল বৃষ্টির মতই
কিছুটা আমার শুষে নিয়েছে উত্তাপ
বাষ্প হয়ে উঠে গেছে আকাশের দিকে
কিছুটা আমার নেমে গেছে মাটির ভেতরে শিকড়ের দিকে
বাকিটা গড়িয়ে চলেছে
কেউ তো আমাকে দেখে বুঝতে চায় না
আমিও একদিন আকাশ থেকে
মেঘ ফেটে মাটিতে পড়েছি
বিদ্যুৎ আমার সহোদর

ভালো থেকো

'ভালো থেকো' বললাম তাকে
'ভালো থেকো' বললাম যেই
চোখে জলের ফোঁটা পড়ল মাটিতে
জলের তীক্ষ্ণ শব্দে চরাচর চমকে তাকায়
ফোঁটাটুকু হাতে তুলে নিয়ে সে তখন বলে
'নাও তুলে রাখো'
চোখের জলের ফোঁটা মাটিতে পড়লে
বড় তীব্র শব্দ হয়
সেই শব্দে মানুষের ঘুম ভেঙ্গে যায়

আমি সেই জলের ফোঁটা হাতে তুলতেই
আঙুলের ফাঁক দিয়ে ফের পড়ে যায়
পড়ে গিয়ে ঝর্ণা হয় ফোয়ারা হয় নদী হয়ে যায়

সেই নদীর তীরেই বাস করি এখন আমরা

আমি মানুষের মেয়ে

এইখানে বসে আছি নদীটির ধারে
আমার চারপাশে হাওয়া ঘুরে ঘুরে ঘুরে
নদীর সঙ্গে কথা বলে চলে
ওরা তো আমাকে কোন পাত্তাই দেয় না
ভাবে আমি মানুষের মেয়ে
ওদের কথা আমি কিছুই বুঝি না
কিন্তু আমি কিসের দুঃখ হাওয়ার
কোন দুঃখে নীল হয়ে আছে এ যুগের হাওয়া
আমি জানি কিসের বাঘ নদীর
কোন ষড়যন্ত্রে আজ খোলা হয়ে গেছে
স্বচ্ছ নদীর জল
নীল হাওয়া ঘোলা জল কাঁধে হাত রেখে
দুঃখ বিনিময় করে
আমি সব শুনতে পাই
আমাকে যে থাকতেই হয় এই হাওয়ার ভেতরে
এই নদীটির ধারে
জল আর হাওয়ার দুঃখ সব জানি আমি
কিন্তু আমি মানুষের মেয়ে সহায়সম্বলহীন
সাধ আছে সাধ্য নেই
তাই একা একা
হৃদয়নদীর জলে মন বাতাসের হুহু শব্দ শুনি

যাওয়া

উঁচু জল। আমাদের পর্ণকুটিরের ছাঁচা-সই
হাতির পিঠের মতো স্রোত এসে থামে।
বিনা আমন্ত্রণে, শুধু অনুপুঙ্খহীন সব ফেলে,
একা একা আমাদের চ'লে যেতে হবে।

আজ নিয়ম-রহিত কোন গান নেই ; তবু যদি
পথে পদচিহ্ন, হরিতকি-গন্ধ রেখে যেতে পারি,
ওই পরিতাপহীন তটরেখা থেকে
আমাদের আর কোন শোকগাথা নেই।
আজ তার 'পরিত্রাণ'-হীন গানে গানে
শুধু চ'লে যাওয়া।

অভয়ভূমি

পাখার বাতাস বুঝি! খাওয়াই হয়নি কতোদিন, তাই ভয়।
যদি বোতাম খোলার আগে ছুটে এলে, তবে বলো—
সে তোমার কোন প্রেম? নাকি দিলে মনে মনে হাতের সন্ত্রাস!
তবু আজ অতিথির মতো, কিছু যন্ত্র-আত্তি পেলে ভুলে থাকি।
রোদে উন্মুক্ত হৃদয়, সেতো সকালের গাঢ় স্মৃতি, ভাঙা ছায়া!
এখন অভয়ভূমি, পরিখা-ঘেরা অরণ্য-সখা। তাকে ফেলে?
নেহাৎ বোকামী। যদি আমি স্বভূমির অবয়ব ছুঁয়ে দেখি
তবে নির্ণি কেঁপে ওঠে, অদৃশ্য হাতের করতলে।

গাছের অলস হাওয়া, ছায়া-ঘেরা, আমাদের মৃদুমন্দ হাঁটা।
যতটুকু যুদ্ধ মানি তার নিচে সব যুদ্ধ শেষ। সমকক্ষ?
শুধু শস্য মানি, জল মানি, সেও অন্যতর ভাষা। যাকে চিনি—
আমাদের যাত্রাপথে জড়ো করা ঠোঁটের অক্ষর।

শ্যামাপ্রসাদ সরকার

লক্ষ্ণৌ

এই যে হঠাৎ পালিয়ে আসা, এমন করে নোটিশ ছাড়া
তোমরা বলো, একেই বলে বাউণ্ডুলে মনের আশা।

শহরজুড়ে ইতিহাসের স্মারকলিপি, ছুটির বাঁশি
বাজিয়ে আনে পর্যটকের রাঙারাখি।
লক্ষ্ণৌ তাই টানলো আমায়, যেমন টানে মধুর বাঁশি,
দূরের বাতাস শব্দ শোনে কোথায় এখন স্বপ্ন রাখি।

রেসিডেন্সী, ইমামবাড়া, পার্কে পার্কে সুরের ঝিলিক,
নবাবী পোশাকে হাঁটে বাদশাজাদার কোন অতিথি?
অবাক করে পথের মাঝে হঠাৎ যদি আজান শুনি,
কিংবা ধরো ক্ষ্যাপা পাগল আতর মাখে নদীর ধারে।
ভুলিয়ে দেরে ভুল ভুলাইয়া মনের যত দুঃখ ক্লেশ
চতুর্দিকে রোদের আলো, মুগ্ধ করা সোনার বেশ।

খোকন বসু

কোনার্ক

চণ্ডাল ছুঁয়েছে বলে এ মন্দির কোনোদিনও পূজো পায়নি

শীর্ষচূড়ায় মঙ্গলঘট প্রতিস্থাপনের স্থাপত্য জানি না
ফলে উদ্ভিদ ক্রমশ রূপান্তরিত হয় পাথরে
পাথর ক্রমশ রূপান্তরিত হয় সূর্যরথের ষোড়শ চাকায়

এবং মানুষ পাথরে উৎকীর্ণ করে নগ্ন রতিশিল্প
ভোর ভোর রোদ উঠতেই জেগে ওঠে প্রাচীন সূর্যদেবতা
পাথরের চাকায় গতিকাব্য। নৃত্যরথে মন্দাকিনীর মুদ্রা

সূর্যকে ভয় পেয়ে পালালো সেই শাদ্র সভ্যতার খণ্ডহর

প্রস্তরের পুরনো শ্যাওলার গায়ে মাটির সূর্যকান্ত উর্বরতা
ছায়া মন্দিরের গায়ে সূর্যরাগের আত্মরতি খেলা
ফলে উদ্ভিদ ক্রমশ রূপান্তরিত হলো পাথর কথায়

আলপাইন

যখন শিশির নামে, এই উদ্বেল
আগুনাভা তির্যক কার্নিসের ঢালে
স্ক্রীনের উপরে ঘাস, বড়ো অমসৃণ
জানলা, শান্ত ঘর, তীক্ষ্ণ কার্পেট
টাঙানো দেয়ালে আর নীল মৌমাছি
ফিরে আসে বারবার ; শ্রান্ত ডানায়
বাতাস ছড়িয়ে দিতে সুসজ্জিত ঘরে।
ওদিকে জাগল এক শ্বেত প্রজাপতি
কম্বলের ওমে ঢাকা রুগ্ন কবিও
আরেকবার জেগে উঠে অলস শরীরে
টেনে নেয় ঘন বাষ্প, বিকেলের স্রাব···
তৎক্ষণাৎ শীতলতা, বারান্দার কাঁচে
নেমে আসে ফর্সা নোখ, প্রলম্বিত হাত
কনুই অবাধ সাদা, দীর্ঘ দস্তানা
এবং উষ্ণ মুঠো ধ'রে আছে মোলায়েম
কয়েকটি নিজস্ব আলপাইন ফুল
আলোকিত ব্যালকনি ভ'রে উঠছে স্নিগ্ধ সুঘ্রাণে···

বৃষ্টি, তুমি

বৃষ্টি তোমায় শরীর দেবে একটি সোয়ালো
হৃদয়ভরা অগ্নি, কিছু গভীরতর সাপ
শব্দময় বৃষ্টি, নির্জনের—উদাসীন
বৃষ্টি তোমায় শরীর দেবে দুঃখী সোয়ালো

ক্লান্তি সারা দেহের, ঢেউ, আঘাত, টালমাটাল···
বৃষ্টি খুবেই ব্যস্ত ? মৃদু, তরল প্রক্ষোভে
তোমারই ঠোঁট, স্বচ্ছ নোখে-ফেনায় তোলপাড়
চোখের নীচে অন্ধকার, রক্ত-আভা, নুন

বৃষ্টি, শুধু লবণ, তুমি ছোট্ট সোয়ালোর
ডানায় নামো বজ্র আর পাথরে কর্কশ
আজ পুড়ুক, ঝলসে যাক রক্ত, ঘূর্ণিতে !
বৃষ্টি, তুমি শরীর দিও মুগ্ধ সোয়ালোকে···

খড়

তোমার ফর্সা গালে রাখা দু'টি খড়
সযত্ন, মসৃণ আভায় তরুণ, উদ্ধত,
তীক্ষ্ণ, ফিকে ও সাদা ত্বকে বিহ্বল,
রেখেছে স্তব্ধতায় সরু-নীল শিরা দু'টি—খড় !

স্বপ্নে যাকে আরো বেশী স্পর্শসহনীয়
মনে হয়—তোমার সে-নির্জন দেহে
নিখুঁত খড়ের দাগ—প্রসারিত আলো ;
আনত শরীর ছেড়ে দূরপ্রজন্মের ভালোবাসা···

সেখানে তোমার বাঁকা উষ্ণতর ঢেউ
শত গভীরতা থেকে পৃথক, ছিন্ন—শুধু খড়
ঝাপসা রেখায় ভাসমান—এখনও যা আবিষ্কৃত নয় !

তুমি আংশিক

আবেশে যাই বলি এখন যা বললাম ওটাই ঠিক।
যা ইচ্ছে মনে করতে পারো, অনেকগুলি অংশ নিয়ে গোটা আমি
প্রতিটির মধ্যেই অস্তিত্ব দারুণ টের পাই
যখন যেখানে থাকি।
সারাদিনের তালিকা মিলিয়ে দেখলেও বুঝতে পারো
কথাটা মিথ্যে বলিনি
আর এভাবেই একজন মানুষ একটা ঘরে চাবি দিয়ে
অন্য ঘরের দরোজায় হাজির।
ক'জন সার্থক তো আপন ঘরেই ভোলে
বিভোর, সমর্পণ এক ঘরে।
তেমন তো পারলাম না কোনদিনই আমি
যা চেয়েছিলাম বস্তুত
আলটপকা বলে ফেলেছি যা ওটাই সত্য
এতোটা বয়সে নিজের কাছে সম্পূর্ণ হতে পারলাম না এখনো,
তা তোমাকে।

খুঁজে যাচ্ছি

নারীর ভেতর আলগা ক'রে খুঁজে যাচ্ছি নারী
তার ভেতরে, তার ভেতরে, তার ভেতরে
অন্য কোনো নারী।

নদীর ভেতর জল পাল্টে খুঁজে যাচ্ছি নদী
তার ভেতরে, তার ভেতরে, তার ভেতরে
অন্য কোনো নদী।

শোকের ভেতর ঠোঁট ডুবিয়ে খুঁজে যাচ্ছি শোক
তার ভেতরে, তার ভেতরে, তার ভেতরে
অন্য কোনো শোক!

চোখের ভেতর বিষ জড়িয়ে খুঁজে যাচ্ছি চোখ
তার ভেতরে, তার ভেতরে, তার ভেতরে
অন্য কোনো চোখ।

খুঁজে যাচ্ছি, খুঁজে যাচ্ছি, দিনরাত্রি, খুঁজে যাচ্ছি সাপ
তার ভেতরে, তার ভেতরে, তার ভেতরে
হৃদয় ছারখার।

বেগবাগান জংশন

ঠিক পৌনে দশটার সময় যথারীতি গাড়ীগুলো স্তব্ধ হয়ে যায়
গদের আঠার মত লেগে থাকে রাস্তার ওপর—জানালার কাঁচে
রাস্তাঘাটে মানুষজন, যানবাহনের ছায়া পড়ে—আমি তা লক্ষ্য করি
নিয়তির মত হাতঘড়ির কাঁটা বাজে। কিছুপর চাবিদেওয়া পুতুলের মত
গাড়ী চলে। আবার স্তব্ধ হয়। পুনরায় চলে। পুনরায়।

আমি এর নাম দিতে চাই—বেগবাগান জংশন। এইখানে,
ওয়াটার বটল্ নিয়ে আলতো পায়ে নেমে পড়ে লোক।
তারপর ফিরে এসে গ্যাস বেলুনের মত বালিশ ফুলিয়ে
মাথা রাখে—পরমাত্মীয়ের মত পরচর্চা সেরে—
মিহিদানা খায়। তারপর পায়ের ওপর পা তুলে
সিগারেটে সুখটান দিয়ে, কামানের হিস্যা নিয়ে তর্ক তোলে,
ভাঙ্গা মন্দির থেকে জন্ম নেওয়া সন্ত্রাসের গল্প,
রবিশংকরের বিবাহের গল্প—এইসব।

এইভাবে বাণিজ্যের কাছে নতজানু মানুষের তছনছ জীবনের
গল্পগুলো বাড়তে বাড়তে একদিন চিরতরে থেমে যায়

এইখানে, জংশনে, বেগবাগানের মোড়ে, পৌনে দশটায়।

দুপুর

একটা শান্ত পুকুর
একটা ঢোঁড়া সাপ ভেসে আছে নিশ্চিন্তে
একটা দীর্ঘ দুপুর
একটা মানুষ ঘুমিয়ে আছে নিশ্চিন্তে
বাতাসে ভাসছে একটা বাঁশির সুর—

একটা ভালোবাসা আলগোছে পড়ে আছে
বন্ধ দরজার ওপাশে
একটা ব্যক্তিগত জীবনের মধ্যে আর একটা জীবন
এ সময়ে ফিস্‌ফিস করে বলে—বেশ আছি, তাই না ?

হঠাৎ উড়ে যায় দুপুর রোদের গরম পাখী
শান্ত পুকুরটায় জাল পড়ে—ঝপাৎ
ঢোঁড়া সাপটা ডুবে যায় ক্রমশ
একটা চুপচাপ ভালোবাসার মধ্যে
হঠাৎ কড়া নাড়ার শব্দ,

হাওয়ার শব্দে দুপুর খান্‌খান্ হয়ে ভাঙে।

কাজুকো শিরাইশির কবিতা

কাঠঠোক্‌রা

একটা কাঠঠোক্‌রা হাজির হয়, একনাগাড়ে
খুঁড়ে যাচ্ছে একটা গর্ত
একটা কাঠের বাড়িতে
একটি মানুষ ছিটকে বেরিয়ে আসে
আর ওকে ভয় দেখায়

আট বছর ধরে মানুষটা
একটা বাড়ি বানিয়েছে
তার বউ আর দুই ছেলের জন্য
তারপর
কাঠঠোক্‌রা গর্ত করবার আগেই

এক অদৃশ্য কাঠঠোক্‌রা হাজির হয়ে
তার স্ত্রীর মধ্যেই একটা গর্ত করে দিলো

সেই থেকে তার বউ
কোথায় যে উড়ে পালালো
আর ফিরলো না

কাঠঠোক্‌রারা হাজির হয়, একনাগাড়ে
ঠুক্‌রে যায় মানুষের কাঠের বাসা

ছোট্ট গ্রহ

এই ছোট্ট গ্রহের মাথার যন্ত্রণা সুরু হয়েছে
যখন থেকে মানুষরা একে পেয়ে বসেছে
আর কেড়ে নিয়েছে ঈশ্বরের হাত থেকে
সবুজ শোণিত শুকিয়ে যায়
পৃথিবীর শিরা ধমনি ঝরে যায়
তিমিমাছে বিদ্ধ হয় হারপুন
সে তার প্রেমের টেলিপ্যাথি-গান
গাইতে পারার আগেই
বিপুল জেট-মাছিরা এই গ্রহের মাথার
চারিপাশে গোল হয়ে ঘোরে
আর পশ্চিমটাকে
কঙ্কালের মুণ্ডু করে ফ্যালে
গ্রহেরা ঘাড়মুড় ভেঙে ছুটছে
পুরো একুশ শতকটা জুড়ে
ইতিমধ্যে খুনের দল বিজ্ঞান ঠাকুরের
পুজোর নেশায় মাতে
আর অস্ত্রদৌড়ে মদত্‌ দেয় চীৎকারে
পৃথিবীর মাথায় লাথি মেরে তার
চামড়া ফুটো করে দেয়
পৃথিবীকে দেখে মনে হয় সে
আর কোনকালেই সেরে উঠবে না

বড়ো বেশি মানুষ ব্যতিব্যস্ত হয়ে আছে
টিভি দেখার কাজে
আর কেউই উচ্চবাচ্য করছে না
গ্রহটাকে বাঁচানোর ব্যাপারে
কেউ কি চেয়েও দেখবে
আমাদের ছোট্ট এই নোয়ার আর্ক
এই ছোট্ট গ্রহের ডুবে যাওয়া
বিপুল সৌরজগতে ?
এক যদি কোনদিন কেউ
মাটি খুঁড়ে উদ্ধার করতে পারে
সেই টাইম ক্যাপসুলটা
যার নাম ভবিষ্যৎ

খরা

একদা জলের কাহিনী শুনেছিলাম হঠাৎই এক অন্ধ যামিনীর টকটকে লাল ঠোঁটে। তার সাদা বিছানা এবং বাদামি বালিশের ওপর দিয়ে বয়ে যাচ্ছিল তীব্র খরা-প্রবাহ। শিয়রে লোলজিহ্বা দেবীমুখ জুলজুল দেখছিলেন সবই। মৃত-স্বামীর-খাট-ধরে-বসে-থাকা সেই করুণ মেয়েটি ছবি থেকে উঠে এসে হাসতে-হাসতে পরতে-পরতে খুলে ফেলছিল নিজেকে। খুলে, শুয়ে পড়েছিল অবিকল বিচরণ-ভূমির মতো।

হাসতে-হাসতে তার কি মনে পড়ছিল দূর ক্যানেলের কথা! না-হলে কী করে তার চোখে ভেসে ওঠে বিকল্প চায়ের মায়া ও মমতা অপলক! কেনই-বা 'জল দাও, জল দাও' ভাঙছিল সে অবিরল খোয়াইয়ের মতো!

আমি তার রন্ধ্রের ভিতর অস্থির জিভ ঢুকিয়ে জল-তৎপর হই। লেহনে-লেহনে চক্ষুযুগ ভরে যায় জলে। শুষ্ক কুয়োর মুখে ঈষৎ ঝুঁকে পড়লে চোখে পড়ে তলপেটের কিলবিল গ্রন্থনা যেন এঁকে-বেঁকে চলে গেছে গুঢ় মোহানার দিকে। আর, চারদিকে, অহেতুক চক্ষুজল-ব্যতীত আর-কোনও জল নেই, জলাধার নেই, শুধু জলতেষ্টা আছে।

প্রাকারের বাইরে ওঁত পেতে ছিল আততায়ী, সশস্ত্র। জল-সন্ধানের দায়ে আমাকে তারা ছুড়ে দিল অন্ধকারে, সাপ ও ব্যাঙের গুহায়। হাহাকারে ডুবে যাওয়ার আগে যেন আবছা শুনেছিলাম দূরে মাঠ ভেঙে ছুটে আসছে কোন্ অলৌকিক ক্যানেলের জল, জলের শেষ ছলাৎছল ধ্বনি।

ভেসে পুনরায় ফিরে গিয়েছিলাম সেই পীঠে। সহস্র টুকরোয়, তুমুল করতালীর মতো, ছড়িয়ে আছে প্রতি ঘরে গতানুগতিক শোক ও দেবীমুখ, দেখি। সামনের মাঠে খাঁ খাঁ ধুলো উড়ছে। শুকনো শালপাতা দিগন্তের দিকে উড়ে যাচ্ছে হা-হা। বিদ্যা নেই, অবিদ্যা নেই কোথাও। সব শান্তিকল্যাণ হয়ে আছে।

গুপ্তচরের মতো কাপড়ে মুখ ঢেকে পরিক্রমা চলে তবু। নীল জ্যোৎস্নায় উদ্‌ভ্রান্তের মতো উড়ে যায় সাদা চাদর। খুঁজতে-খুঁজতে গলে যায় সর্বাঙ্গ। গলিত শরীরে কুষ্ঠরোগীর মতো ফিরে আসি ঘরে। মরু-ঝড়ে ডুবে যায় শরীর। ভাঙতে-ভাঙতে শূন্য হই, স্তব্ধ হই। শুধু কখনো, অস্পষ্ট জাগরণে, মনে পড়ে, একবার শুধু জানতে চেয়েছিলাম জলের কাহিনী, জল-ব্যবহার, তার কাছে, একবার, পুনর্বার।

গুঞ্জনের মতো

কোথা থেকে অন্তর্বিহীনভাবে জল নিয়ে
ছোটো ছোটো লাল পিঁপড়ে উঠে আসে নাবাল জমির ধার ঘেঁষে।
হা! এই তো উড়িয়ে দিলাম, না কোনো পিঁপড়ে আর দিকচিহ্ন-সীমানায় নেই
নাকি আছে? এমন গোপন গভীরভাবে আছে যে অনুবীক্ষণ ছাড়া
আর কিছুতেই তবে বোঝবার উপায় নেই—
যদি না খোঁদল চৌদল জুড়ে কামড়ানো আঁচড়ানো থাকে
তাহলে সে অনেক ভিতরে ব'সে যদি
শত শত ডিম্বকের জন্ম দেয়, তাহ'লে কি ক্ষতি?
আমি তো বাইরে থেকে আশপাশ মাঠজমি, আকাশের খানিকটা
পরিষ্কার করে দিতে পারলাম—
ভিতরে অস্ফুট জাগরণ এখন কি গুঞ্জনের মতো?

কে কাকে হরণ করবে?

এসেছো, শেয়ালী, তুমি এই জনবসতির মধ্যে হঠাৎ একেলা—
সন্ধেও তেমন নামেনি, আশেপাশে বাঁশঝাড় নেই—
কাকে চ'মকে দেবে ব'লে ঐ ট্যারাচোখে, জ্বলজ্বল ক'রে
তাকিয়ে রয়েছো।
নাকি তুমিই অবাক হ'য়ে গেছো এই সব পার্থিবতার তামাসায়,
কিছু পরে চাঁদ উঠবে—ঐ তো উঠলো, এখন মানানসই
শিকারের লোভে তুমি আরো কি সেঁদিয়ে যাবে
ঘরবসতির মাঝখানে,
কোন মানে নেই, মানে তো এটাই মানে নেই,
নাকি সবই অর্থগূঢ় হ'য়ে আছে, ওপরটা এরকম
প্যাংলা প্যাংলা হ'য়ে থাকে—
কে কাকে এখন নেবে? মোরগশাবককে ঐ নিবিড় শিয়ালী?
নাকি শেয়ালীকে এই শীতাতপনিয়ন্ত্রিত ঘরের বসতি?